শ্রীশ্রীরামঠাকুর
ও
মাধব পাগলা

শ্রীগুরুতত্ত্ব সাধন

মুক্তানন্দ

শ্রীশ্রীরামঠাকুর ও মাধব পাগলা

অবধূত মাধব পাগলার

শ্রীগুরুতত্ত্ব সাধন

লেখক—মুক্তানন্দ

অক্ষয় তৃতীয়া
১৭ই বৈশাখ ১৩৭৫ সাল

মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

প্রকাশক—

শ্রীচূণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

২. শ্যামলাল ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৪

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীননীকুমার চক্রবর্ত্তী
৮/৩৭, ফার্ণ রোড
কলিকাতা-১৯

২। শ্রীচূণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়
২, শ্যামলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

৩। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় (মুক্তানন্দ)
মুন্নিলাল ধর্ম্মশালা রোড
চারবাগ। লক্ষ্ণৌ

৪। মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ

অক্ষয় তৃতীয়া—১৭ই বৈশাখ ১৩৭৫ সাল

প্রথম সংস্করণ

শ্রীরাম নবমী—৩০শে চৈত্র, ১৩৬৮ সাল

মুদ্রক—শ্রীবাণেশ্বর মুখার্জী
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রীরামঠাকুর ও মাধব পাগলা

বা

শ্রীগুরুতত্ত্ব সাধন পুস্তক

সম্বন্ধে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ, ডি-লিট্ মহোদয়ের অভিমত

অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলার শ্রীগুরুতত্ত্ব সাধন নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটী সৌভাগ্যক্রমে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহা পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরামঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—ইহাতে গুরুতত্ত্ব সাধনার ক্রমবিকাশের চারিটী স্তর সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে সাধারণ অবস্থা হইতে চতুর্থ অবস্থার পরিপূর্ণ উৎকর্ষলাভ পর্য্যন্ত ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। **গুণাতীত অবস্থায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ইহাই প্রেমভক্তির নামান্তর। ইহার প্রাপ্তিই মানবজীবনের** চরম লক্ষ্য। আশা করি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ উপকৃত হইবেন।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

৺কাশীধাম। ইং ৪।৪.৬২

মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কোটীশ্বর ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ এম-এ, এম-ঈডি, মহোদয়ের

শ্রদ্ধা নিবেদন

ব্রহ্মনিষ্ঠ অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলার শ্রীমুখের বাণী সম্বলিত এই শ্রীগুরুতত্ত্ব সাধন পাঠ করিয়া আমি কি যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম তাহা প্রকাশ করিতে কোন দিন সমর্থ হইব কি না—বলিতে পারি না।

এই গ্রন্থের মুখ্য অংশ "গুরুতত্ত্ব সাধনার ক্রমবিকাশ" সিদ্ধগুরু ভিন্ন অন্য কাহারো দ্বারা এমন সহজ সুন্দর ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারিত কি না এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই পুস্তকের অন্যান্য অংশ "অবধূতজীর বাণী অষ্টাঙ্গ ভজন" ইত্যাদি সাধক ও গৃহস্থনির্ব্বিশেষে আপামর জনসাধারণের চিরসাথী হইবার উপযুক্ত।

হিংসা দ্বেষ কলহ জর্জ্জরিত বর্ত্তমান বিশ্বে এইরূপ উদার ও শান্তির বাণী গৃহে গৃহে প্রচারিত হইলে উৎপীড়িত জনসাধারণ হয়তো কিছুটা শান্তি লাভ করিতে পারিবেন।

এই পুস্তকে লিখিত বাণী আত্মদর্শনার্থী পথিকগণের পাথেয় স্বরূপ হউক ইহাই শ্রীশ্রীগুরুপদে প্রার্থনা।

৺কাশীধাম। ইষ্টচরণাশ্রিত
ইং ৬. ৪. ১৯৬২ শ্রীকোটিশ্বর ভট্টাচার্য্য।

৺কাশীধামের বিখ্যাত ভাগবতপাঠক

পরিব্রাজক

শ্রীমৎ অনাদিচৈতন্য ব্রহ্মচারী [S. Sen M.A. (Cal.)]

মহোদয়ের অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলার প্রতি

শ্রদ্ধা নিবেদন

বুদ্ধিতত্ত্বে স্থিতা বৌদ্ধাঃ
গুণেম্বেবার্হতাঃ স্থিতাঃ।
স্থিতা বেদরতাঃ পুংসি
অব্যক্তে পাঞ্চরাত্রিকাঃ।
বৈষ্ণবাদ্যাশ্চ যে কেচিৎ
রাগতত্ত্বেন রঞ্জিতাঃ।

—অভিনব গুপ্ত।

অভিনব গুপ্ত বিরচিত তন্ত্রালোক মতে—বৌদ্ধ, আর্হত, বেদবিৎ, পাঞ্চরাত্রিক এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িক ভাবে তত্ত্ববস্তুর এক দিক্ মাত্র দেখিয়াছেন। এইজন্য ইঁহারা পরস্পর বিবদমান এবং গণ্ডীবদ্ধ।

অবধূত শ্রীমৎ মাধব পাগলায় এই সমস্ত গণ্ডী অন্তর্হিত। তিনি ভক্তিশক্তির সাক্ষাৎকার করিয়াছেন।

এক সময়ে ইনি শৈলজাকান্ত মুখোপাধ্যায় নামে কলিকাতা আশুতোষ কলেজের প্রতিভাশালী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় ইনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া পাশ করেন।

এই অবধূতপ্রবরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বেদান্তের গূঢ় অর্থ ইনি যেরূপে প্রকাশ করেন, সেরূপ সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করিতে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখি নাই। লোকে তাঁহার অলৌকিক শক্তির কথা বলিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার দশ জন্মের কথা কীর্ত্তন করিতে পারেন, ইহা কিন্তু অলৌকিক নয়। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী গীতার—৪।৬ শ্লোকের

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।"

ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—নন্বতীতানেকজন্মবত্ত্বমাত্মনঃ স্মরসি চেৎতর্হি জাতিস্মরো জীবস্ত্বং। পরজন্মজ্ঞানমপি যোগিনঃ সর্ব্বাত্ম্যাভিমানেন "শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতুপদেশো বামদেববৎ" ইতি ন্যায়েন সম্ভবতি। অর্থাৎ—আচ্ছা, তুমি যদি নিজের বহু অতীত জন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি না হয় জাতিস্মর জীব হইবে। শাস্ত্রদৃষ্টিবশতঃ অর্থাৎ তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্তবাক্যজনিত আত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়াছে বলিয়া বামদেবের (সর্ব্বাত্ম্যাভিমান পূর্ব্বক) উপদেশ হইয়া থাকে। এই ন্যায়ানুসারে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের উক্ত সূত্র-সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে সর্ব্বাত্ম্যাভিমানবশতঃ যোগিগণের পরজন্মজ্ঞান সম্ভব হয়।

ইহা অলৌকিক নয়—অর্থাৎ সাধন দ্বারা লোকে ইহা জানিতে পারে। পাতঞ্জল দর্শন বিভূতি পাদ ১৮শ সূত্র—

"সংস্কার সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম।"

[অর্থাৎ সংযম দ্বারা সংস্কার সাক্ষাৎকার হইলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান (স্মৃতি) হয়। (ধ্যান, ধারণা, সমাধি—এই তিন একত্রিত হইলে সংযম হয়।)]

ব্যাসভাষ্যে উল্লেখিত আছে (১) বাসনা (২) ধর্ম্মাধর্ম্ম পূর্ব্বজন্মে কৃতকর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত, পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ শক্তি ও জীবন ইহাদিগের ধর্ম্ম, ইহা চিত্তে অবস্থিতি করে। এই সকল সংযম করিলে সংস্কারের স্বরূপ সাক্ষাৎকার বিষয়ে সামর্থ্য জন্মে। উদাহরণস্বরূপ —মহর্ষি জৈগীষব্যের ও আবট্য দেহধারী শ্রীভগবানের কথোপকথন। জৈগীষব্য ভগবান আবট্যকে সর্ব্বোত্তম সুখ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—দশকল্পের জন্মবৃত্তান্ত জানিয়া তিনি ইহাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে—বিষয় সুখের তুলনায় এই সর্ব্বৈশ্বর্য্যজনিত সন্তোষ সুখ অনুত্তম সুখ, কিন্তু কৈবল্যের সহিত তুলনায় ইহা দুঃখ বলিয়া গণ্য।

এ সন্তোষ বুদ্ধিসত্ত্বেরই ধর্ম্ম; তৃষ্ণা তন্তু সদৃশ। এই তৃষ্ণারূপ দুঃখের সন্তাপ অপগত হইলে বাধরহিত সর্ব্ববিষয়ে অনুকূল সুখলব্ধ হয় বলা যাইতে পারে।

ইন্দ্রিয়জয়ী এবং শ্বাসজয়ী ভগবানে চিত্তধারণ করিলে সেই যোগীর নিকট সিদ্ধিসমূহ আপনা হইতে উপস্থিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৫।১ শ্রীভগবানুবাচ।

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ।

যোগাদি দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় মদ্ভক্ত বিনা আয়াসেই তাহা প্রাপ্ত হন। এই ভক্তিশক্তিই শ্রীপাদ মাধব পাগলাকে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত অবগত করাইয়াছেন। তাঁহাকে যোগাদি দ্বারা অনুষ্ঠান করিতে হয় নাই। তাহার প্রমাণ—

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৩২—৩৩

যৎ কর্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ
যোগেন দানধর্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসা
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি।

এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এই—কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা তীর্থযাত্রা ব্রতাদি অন্য শ্রেয়ঃ সাধন কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, আমার ভক্ত মদ্বিষয়ক ভক্তিযোগ দ্বারা এই সমুদয় অনায়াসে লাভ করেন এবং যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) অথবা মদীয় সালোক্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন।

এই ভক্তিতে নৃমাত্রস্যাধিকারিতা। ইহাতে অতিমানবতা কিছুই নাই।

এই মাধব পাগলার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? ইহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৭।৪৬) বলেন—

"ক্বচিচ্ছন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্
ভুঙ্‌তে সর্ব্বত্র দাতৃনাম্ দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্।

অবধূত অগ্নির ন্যায় কখন প্রচ্ছন্ন, কখন বা ব্যক্ত হইয়া মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তিগণের উপাসিত হইয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ অশুভ দমনপূর্ব্বক দাতাদের নিকট সর্ব্বত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলার দশ জন্মের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করার কথা সাধারণ পাঠকবর্গের যাহাতে সহজ বোধগম্য এবং বিশ্বাস করিতে সুবিধা হয়, সেই জন্য উপরে লিখিত শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা তাহা প্রমাণিত এবং সমর্থিত হইল।

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব এই অবধূত মহারাজকে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় ইনি এক বিশেষ শ্রেণীর সাধকভক্ত এবং উত্তমা ভক্তির অধিকারী পুরুষ।

বৈষ্ণবীয় ভজনতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে— উত্তমাভক্তির অধিকারী না হইলে সেই সাধকের দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন সম্ভবপর হয় না।

এই গ্রন্থে "স্বপ্নযোগ" শব্দটি পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন "স্বপ্নযোগ" আবার কি? তাহার উত্তরে বলা যায় স্বপ্ন তম ও রজোগুণ প্রসূত।

"রজস্তমোগুণে না পাই শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্ম"

(চৈতন্য চরিতামৃত, অ—৪)

অর্থাৎ স্বপ্নে (শ্রীকৃষ্ণ) তত্ত্ব প্রকাশ হয় না। শ্রীপাদ মাধব পাগলা যাহা দর্শন করেন তাহা "শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশ" তাহা স্বপ্ন নহে। কিন্তু তাহা স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হয় বলিয়া স্বপ্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থেও এই শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকাশ "স্বপ্ন" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

পাঠকবর্গ আমার এই নিবেদন পাঠ করিয়া যদি কিছুমাত্র আনন্দিত হন তবে আমার সেবা সার্থক মনে করিব।

অনাদিচৈতন্য ব্রহ্মচারী

৺কাশীধাম। অক্ষয় তৃতীয়া। ১৩৬৯ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

প্রকাশকের নিবেদন

আজ অক্ষয়-তৃতীয়ার পুণ্য তিথি—এই দিনে শ্রীশ্রীরাম-ঠাকুরের তিরোভাব ঘটেছিলো—সে ছিল ১৩৫৬ সাল—সে সময় আমি ছিলেম যুবক, ধর্ম্মগ্রন্থের বা আধ্যাত্মিক জগতের কোন সংবাদ আমি রাখিনি আজ ১৩৭৫ সাল—কালের চাকার সাথে জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে আজ এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে মানুষের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে যা ঘটছে, যা ঘটবে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী। মানুষ মনে করে সে করছে—এটা তার অহমিকা ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃতপক্ষে সে যন্ত্র—ঈশ্বর যন্ত্রী।

প্রমাণের জন্য আমার জীবনই যথেষ্ট—আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করে যদি মনের ব্যথা ব্যক্ত করা যায়, ঈশ্বর তাহা শ্রবণ করেন—এ কথা আমার জীবনে আমি অনুভব করেছি।

বহুদিন থেকে আমি বারাণসী যেতে ভালবাসি—বহুবার গেছি, কিন্তু ১৩৭৪ সালের ১২ই পৌষ—(ইং ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭) আমার জীবনে এক নবপ্রভাত। ঐ দিন বারাণসীর ৩২।৬৫, পাতালেশ্বর মহল্লার মসজিদে আমার দীক্ষা লাভ হয়—দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রী "মাধবপাগলা"।

দীক্ষালাভের মাত্র তিনদিন আগে তাঁকে আমি প্রথম দর্শন করি। মনে হয়েছিলো—উনি আমার কত পরিচিত। হয়তো

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করলেম। উনি অবধূত—থাকেন মসজিদে। কোন নিয়ম-কানুন নেই, শুধু জপধ্যান—নামজপ। আমাকে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন—মনে হ'ল—সারা দেহমন আলোকিত হয়ে উঠল। ওঁর কথা, বাচন-ভঙ্গীর সরলতা এবং তীব্রতা হৃদয়কে আলোড়িত করে তুললো।

মাত্র কয়েকদিন ছিলেম, এরই মধ্যে আমার ওপর তাঁর "শ্রীশ্রীরামঠাকুর ও মাধব পাগলা" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ভার দিলেন।

আশীর্বাদ গ্রহণ করে কলকাতায় ফিরে এলেম। পুস্তকের দ্বিতীয় প্রকাশনের কাজ শুরু করলেম। সহজেই হয়ে যেতে লাগলো। মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার শ্রীশ্রীগুরুর সান্নিধ্যে আবার গিয়েছিলাম। মাত্র দুই দিনের জন্য। ওঁর সান্নিধ্যে এক পরম শান্তি অনুভব করা যায়।

এপ্রিল মাসে ইষ্টারের ছুটিতে প্রতিবার আমি ৺পুরীধামে যাই, এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু তাঁর নববর্ষের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে যা জানলেম, তাতে মন হতাশায় ভরে উঠল। উঁহার বিচিত্র ধরনের অনশন আরম্ভ হয়েছে এবং এই অনশনের মধ্যেই তাঁর দেহান্ত হতে পারে সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন। এই বিচিত্র অনশন তাঁর প্রথম নয়। তাঁর পুস্তকের 'পরিশিষ্টের' শীর্ষাধীনে এই বিচিত্র অনশনের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই অনশন তাঁর শেষ অনশন, এই ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। মাসাধিককাল অতিবাহিত হ'ল—এখনও গুরুদেবের অনশন চল্‌ছে, তিনি তাঁর গুরুদেবকে (শ্রীশ্রীরাম-

ঠাকুর) দেহ নিবেদন করেছেন—একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর জানেন এই অনশনের পরিণতি কিভাবে হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুদেব আমাদের আঁধারে নিক্ষেপ করবেন না। আমাদের জীবনে যে আলোর রেখা শ্রীশ্রীমাধবপাগলা পাত করেছেন—সেই আলোর রশ্মি শুধু আমাদের উদ্ধার করবে না—অনাগত কালের আরও অনেককে উদ্ধার করবে, আমাদের কর্তব্য তাঁর ধারাকে বহন করে যাওয়া।

"ধৈর্য্যই ধর্ম"—এই কথা শ্রীশ্রীরামঠাকুরের। আমার গুরুদেব তাঁর একটি পত্রে সম্প্রতি এই কথাটি জানিয়েছেন।

শ্রীশ্রীমাধবপাগলার কোন আশ্রম নেই, তিনি কোনদিন সাধু সাজার চেষ্টা করেননি—আশ্রমও করেননি।

তাঁর মতে প্রতি শিষ্যের গৃহই তাঁর আশ্রম। যদিও কোন শিষ্যগৃহে তিনি পদধূলি দিয়েছেন কিনা আমি সঠিক বলতে পারি না। কারণ তিনি দীর্ঘদিন বারাণসীতে এই মসজিদেই বাস করছেন।

শ্রীশ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে এই পুণ্য অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন যে আমি তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরেছি—ইহাতে আমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নাই। তিনি তাঁর কাজ করিয়ে নিয়েছেন। আমার বিশ্বাস কর্ম্মজীবনের দায়িত্বের মধ্যেও যদি নিজেকে এইভাবে শ্রীশ্রীগুরুর সেবায় নিবেদন করতে পারি, তবেই আমার সেবা সার্থক হবে। সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠকবর্গের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার নিবেদন শেষ করিলাম। ইতি—

অক্ষয় তৃতীয়া
১৭ই বৈশাখ, ১৩৭৫
২নং শ্যামলাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

বিনীত প্রকাশক
শ্রীচুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ

সবিনয় নিবেদন

মদীয় আরাধ্য গুরুদেব অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলা মহারাজের শ্রীমুখ হইতে আমার গুরুভ্রাতা মুক্তানন্দ যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ লিখিয়াছেন। মহাপুরুষের মুখের বাণীই শাস্ত্র। শাস্ত্র প্রণয়নের অধিকার আর কাহারও নাই। মুক্তানন্দ এ গ্রন্থের প্রণয়নকর্ত্তা নহেন; তিনি শ্রোতা মাত্র।

এ গ্রন্থ প্রকাশনের গুরুদায়িত্ব মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির উপর ন্যস্ত হওয়ায়ই আমি ইহাকে শ্রীশ্রীগুরুদেবের আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়াই জানিয়াছি।

এই গ্রন্থে বন্ধনীমধ্যস্থ কথাগুলি মাত্র আমার। প্রকাশনের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় এ গ্রন্থে অনেক ভুল ত্রুটি থাকিয়া গেল।

এতৎ সত্ত্বেও, সহৃদয় পাঠকবর্গ কিছুমাত্র আদরের সহিত ইহা গ্রহণ করিলে আমি আমার সেবা সার্থক মনে করিব।

পোঃ নেকুরসেনী,
মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ

বিনীত—
প্রকাশক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র জেনা

শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচয়

পূর্ব্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার ডিঙ্গামাণিক গ্রামের মহাসাধক
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রদেব দয়ানিধি।

আবির্ভাব দিবস—বাং ১২৬৬ সাল ২১শে মাঘ বৃহস্পতিবার
রোহিণীনক্ষত্র, শুক্লা দশমী তিথি।

তিরোভাব দিবস—বাং ১৩৫৬ সাল ১৮ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া
তিথি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রমের ঠিকানা :—

১। শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
(পূর্ব্ব পাকিস্তান)

২। শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম, পোঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
(কলিকাতা)

৩। শ্রীশ্রীসমাধি মন্দির, চৌমুহনী, নোয়াখালী।
(পূর্ব্ব পাকিস্তান)

৪। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ সেবা মন্দির, ডিঙ্গামাণিক,
ফরিদপুর, পূর্ব্ব পাকিস্তান।

অবধূত মাধব পাগলার
শ্রীশ্রীগুরু প্রণালী
শ্রীশ্রী১০৮ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী
শ্রী শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরী
শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব
শ্রীশ্রীমৎ অনঙ্গজিৎ স্বামী
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রদেব
অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলা
শ্রীমৎ অদ্বৈত মহাপ্রভু

শ্রীশ্রীগুরুপ্রণালীর বিবরণ—

শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী হইতে শ্রীশ্রীমাধব পাগলা পর্য্যন্ত গুরু পরম্পরায় মাত্র চারি পুরুষ। শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরী মহারাজের অগণিত ভক্ত শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরী, শ্রীমৎ অনঙ্গজিৎ স্বামী ও শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরী মহারাজের শিষ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। চৈতন্যাব্দ গণনায় অদ্যাবধি ৪৭৫ বৎসর হইল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হইতে শ্রীশ্রীমাধব পাগলা পর্য্যন্ত মাত্র চারি পুরুষ কি করিয়া সম্ভব হইল—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়—ঈশ্বর কোটি মহাপুরুষদের (অযাচিত বৃত্তিপুরী সাক্ষাৎ ঈশ্বর—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।) বয়সের পরিমাপ করা যায় না। যেমন চির অমর অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস ইত্যাদি।

অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলার জনৈক গুরুভাই শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ণিত শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের অলৌকিক লীলা প্রবন্ধ হিমাদ্রি পত্রিকায় ইং ১৯৫৮,৭ই এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত। উক্ত প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর চারিবার জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীমৎ অনঙ্গজিৎ স্বামীর নিকট হইতে বারবার দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীমৎ অনঙ্গজিৎ স্বামী এতাবৎকাল দেহরক্ষা করেন নাই। এ কথা শ্রীশ্রীঠাকুর দেহরক্ষার পূর্ব্বে শ্রীমুখেই বলিয়া গিয়াছেন।

অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার

মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে হিমাদ্রি পত্রিকায় যে মন্তব্য করিয়াছেন—তাহা উল্লেখ করা হইল।

"কাশীতে আমার একজন গুরুভাই, ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (লোকে তাঁহাকে মাধব পাগলা বলিয়া ডাকে) থাকিতেন। ইনি ঠাকুরের কৃপায় খুব উন্নত হন। দেখিলে বড়ই আনন্দ হইত। ঠাকুর তাঁহাকে দশ ইন্দ্রিয় ও একাদশ মন—এই নিয়ে মহোৎসব করিতে বলিয়া যান। তিনিও তাহাই করিতেছেন। কাশীর মত শীতে ও গ্রীষ্মে লুর গরমে একখানি কাপড় দুই ভাজ করিয়া লুঙ্গির মত পরেন। ইহাই তাঁহার সম্বল। খালি গায়ে খালি পায়ে পরমানন্দে আছেন। সর্ব্বদা হাসিমুখ, আনন্দের মূর্ত্ত প্রতীক। ঠাকুরের চিন্তাতেই সর্ব্বক্ষণ বিভোর আছেন। দেখিলে মনে হয় যেন ঠাকুরের সঙ্গেই তাঁহার অবস্থিতি।"

হিমাদ্রি পত্রিকা ইং ১৪।২।৫৮

অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলার
গুরু পরিচয়

আচার্য্য গুরু (সাবিত্রী গুরু) ঃ—

মেহারের সর্ব্ববিদ্যাবংশের সিদ্ধ মহাপুরুষ ৺নবচন্দ্র তর্কবাগীশ। সোনাচাকা, নোয়াখালি।

ইষ্টগুরু ঃ—

ফরিদপুরের বিখ্যাত মহাসাধক শ্রীশ্রীরামচন্দ্র দেব দয়ানিধি। ডিঙ্গামাণিক গ্রাম, পূর্ব্ব পাকিস্তান।

দীক্ষাকাল ঃ—

ইং ১৯৩৪ নভেম্বর, ৺কাশীধাম।

শিক্ষাগুরু ঃ—

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ফরিদপুর নিবাসী)—৺কাশীধামে আঠার মাস কাল মাধব পাগলা ইঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে ইনি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আচার্য্য।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ঃ—

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় মাধব পাগলা নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং পূর্ব্বজন্মের "মাধব পাগলা" নাম মায়ের দ্বারা সমর্থিত হয়।

অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলার
বংশ পরিচয়

জন্ম—১৩০৭ সাল, ১৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্লা ত্রয়োদশী, ভরণী নক্ষত্র, মঙ্গলবার।

বাল্যনাম—শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
ছাত্রাবস্থায়—শৈলজাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

পিতা—৺চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় (সুকণ্ঠ গায়ক)

মাতা—৺মনোরমা দেবী। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যা ও বিশেষ আচারনিষ্ঠাসম্পন্না ছিলেন।

পিতামহ—৺শ্যামাকান্ত মুখোপাধ্যায় (কালী সাধক)।

বাসস্থান—গ্রাম—কাচী আইল, থানা—তালতলা, বিক্রমপুর পরগণা, ঢাকা।

জন্মস্থান—মাতুলালয়ে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বিদগাঁও গ্রামে।

মাতামহ—৺পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (বন্দ্যোপাধ্যায়) ইনি বঙ্গীয় সারস্বত সমাজের সভাপতি ও কাশী নরেশের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলার

পরিচয় ও বাণী

[ইহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য ইহা পুনরায় এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হইল।]

পরিচয় ঃ—

১। আমার গুরু প্রণালীর আদি গুরু— শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।

২। আমার ইষ্ট গুরু—ঠাকুর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রদেব দয়ানিধি।

৩। আমার উপাস্য ইষ্ট—শ্রীশ্রীমাধব।

৪। আমি অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে মাথুর ব্রাহ্মণ।

৫। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে অদ্যাবধি দশটী জন্ম গ্রহণ করিয়া রাগানুগ ভজন করিতেছি। ইহাই আমার শেষ জন্ম।

৬। বর্ত্তমান জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে দিব্য উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা আমি বলিতাম—"আমার মাধব খুব ভাল।" সর্ব্বাবস্থাতেই এই কথা বলায় লোকে আমাকে মাধব পাগলা বলিয়া ডাকিত। শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় বিশিষ্টাদ্বৈতের বা চিৎদর্শনের অধিকারী হইয়া এই পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত আমি জানিতে পারিয়াছি। এই জ্ঞান সম্বিৎশক্তির (ভক্তি

শক্তি) স্ফুরণে হয়। তাই এই জন্মে পূর্ব্বজন্মের নামানুসারে মাধব পাগলা নামে পরিচিত।

বাণী ঃ—

১। নামের সাধনে দাও অখণ্ড নির্ভর
বহিবে পাষাণভেদী ভক্তির নির্ঝর।

২। শ্রীশ্রীমাধবকে ভালবাসিয়া "মরিয়া যাও।" ইহাই শ্রেষ্ঠ ভজন।

৩। যে আমাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিবে, সেও সর্ব্বদা আমার চোখে চোখে থাকিবে। যে আমাকে যত নিকট করিবে আমিও তাহার তত নিকটে থাকিব।

৪। বিধি নিষেধের কড়াকড়ি ও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী আমার নাই। সর্ব্ব বিষয়ে আমি মুক্ত। প্রত্যেক শিষ্যের গৃহই আমার আশ্রম। শিষ্যই আমার সন্তান। তাহাদের গৃহপরিজনই আমার আত্মীয়স্বজন।

আমার শিষ্যরা যে কোন সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে পারিবে। প্রত্যেক দেবদেবীকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে। কারণ সর্ব্বত্রই আমার মাধবের প্রকাশ।

৫। যেখানে সাধু গুরু ও ভগবৎ নিন্দা হয় সে স্থান ত্যাগ করিবে। কোন সম্প্রদায়ের সহিত কলহ বা হিংসা করিবে না। সকল মতই ভগবৎপ্রাপ্তির পথ। সুতরাং সকল মতকে শ্রদ্ধা করিবে।

৬। যথাযথভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিলে শ্রীশ্রীবিষ্ণু প্রীত হন। নীতিভ্রষ্ট জীবনে ধর্ম্মলাভ হয় না। ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে।

৭। সর্ব্বধর্ম্মময়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অবশ্যই পাঠ করিবে।

৮। সহজ, সরল ও উদার হইলেই চিত্তের মালিন্য দূর হইবে এবং অনায়াসেই সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

৯। নাম জীবিত। প্রাণহীন শব্দমাত্র নহে। সুখ ও দুঃখের কথা পরম নির্ভরতায় নামকেই জানাইবে। নামের শরণাগত হইলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয় সুতরাং নামকেই আশ্রয় করিও।

১০। সর্ব্বসময়ে সর্ব্বাবস্থাতেই নাম জপ করিবার অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ অখণ্ড জপ ধ্যানের অধিকারী হইবে।

১১। চিত্তে সর্ব্বদা তত্ত্বানুসন্ধানের ইচ্ছা জাগাইয়া রাখিও। শ্রীশ্রীমাধবের কৃপায় শুদ্ধচিত্তে আপনিই তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে।

১২। শ্রীশ্রীমাধবের প্রীতিতেই ভক্তের চরম তৃপ্তি লাভ হয়।

শ্রীশ্রীরামনবমী
২২শে চৈত্র, ১৩৬৬
৩২।৭০ পাতালেশ্বর,
৺কাশীধাম।

মাধব পাগলা

—সূচী—

পরিশিষ্ট

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রদেব দয়ানিধি

আবির্ভাব	তিরোভাব
বাং ১২৬৬ সাল, ২১শে মাঘ	বাং ১৩৫৬ সাল, ১৮ই বৈশাখ
বৃহস্পতিবার	অক্ষয় তৃতীয়া তিথি
শুক্লা দশমী তিথি	

উৎসর্গ

যাঁহার দয়ার কথা এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে গ্রথিত
সেই পরম গুরু
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রদেব দয়ানিধির
শ্রীচরণকমলে
প্রেম অর্ঘ্যরূপে সমর্পণ করিলাম।

৺কাশীধাম।

স্নেহার্থী
মুক্তানন্দ

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের মাধব পাগলার প্রতি

আশীর্ব্বাণী

একবারেই কি হয় ?

নামের গোড়া ধরেন। নামের গোড়া ধরিলেই সব হইবে। আপনার না হলে কি আমার ছুটী আছে ? আপনি মহোৎসব করিবেন। চাল ডালের খিচুরী দিয়ে নহে। দশ ইন্দ্রিয় একাদশ মন—এই নিয়ে আপনি মহোৎসব করিবেন। তবেই আপনি শান্তি পাইবেন।

---

* ওঁ গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্ *

ওঁ নমো মাধবায় ওঁ

শ্রীগুরু তত্ত্ব সাধন

মঙ্গলাচরণ

ওঁ নমঃ শ্রীরামচন্দ্রায় মৃদুমধুরভাষিণে
সৌম্যশান্তাবতারায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ
নমস্তে কৈবল্যনাথায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণে
আশ্রিতানাং মুক্তিদাত্রে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ
পূজামূলং গুরোঃ পদম্
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্
মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।

ধ্যান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীগুরুমূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে।

শ্রীশ্রীগুরুর চরণ যুগলই পূজা করিবে।

শ্রীশ্রীগুরুদত্ত দীক্ষা নাম বা মন্ত্রই যথার্থ মন্ত্র।

শ্রীশ্রীগুরুকৃপাই মোক্ষলাভের একমাত্র কারণ। যেহেতু গুরু-তাদাত্ম্যেই মোক্ষ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাধব পাগলা

১

মাধব পাগলার দীক্ষা গ্রহণের দুই বৎসর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশী আসিয়া রামাপুরায় এক শিষ্যের বাড়ীতে উঠিলেন। মাধব পাগলা এই সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীগুরুদর্শন করিতে যান।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাধব পাগলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নাম জপ হচ্ছে ত?

মাধব পাগলা উত্তর করিলেন—আমার দ্বারা কি করে নাম করা হবে ঠাকুর! আমার মন চঞ্চল, অস্থির। আমার দ্বারা নাম করা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—একবারেই কি হয়? **নামের গোড়া ধরেন, নামের গোড়া ধরলেই সব হবে।**

মাধব পাগলা ঠাকুরের কথায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—ঠাকুর! আমার মনে হয়, আমার দ্বারা কিছু হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—**আপনার না হলে কি আমার ছুটী আছে?**

বিঃ দ্রঃ—শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণতঃ সকলকেই "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে এই বাণী শোনামাত্র মাধব পাগলা ক্ষোভে ও দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীগুরুকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন এবং পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন—হায়! হায়! একি সর্ব্বনাশ, আমি যদি নিজে ঠিকভাবে নাম করিয়া উদ্ধার না হই তাহা হইলে ঠাকুরকে ত আমার জন্য আবার জন্ম নিতে হবে।

মনে মনে ঠাকুরকে বলিলেন—"না-না, ঠাকুর! আমার জন্য তুমি আর আসিও না। আমার পাপ আমি ভোগ করিব। আমার জন্য তুমি দুঃখ সহিতে এ দুঃখের সংসারে আর আসিও না।"

মাধব পাগলা কিছুদিন পর্য্যন্ত এই কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া নিজেকে ঠাকুরের নিকট অপরাধী মনে করিতেন এবং কাঁদিয়া ফেলিতেন।

পরে তিনি শাস্ত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলেন—গুরুর প্রতি যে শিষ্যের এই প্রকার মনোভাব এবং এতটা মমত্ববোধ গুরু সে শিষ্যকে মুক্ত করেই রেখেছেন। শিষ্যের মোক্ষের আগ্রহ বাড়াইবার জন্যই গুরুর এই প্রকার স্বীকারোক্তি।

প্রমাণ ঃ—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

অর্থাৎ যাঁহার পরমেশ্বরের প্রতি পরা ভক্তি এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও সেইরূপ পরাভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই উপনিষদুক্ত এই সকল বিষয় স্বানুভব যোগ্য হয়। অর্থাৎ তিনিই মুক্তির অধিকারী।

২

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কাশী আসিয়া হরসুন্দরী ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছেন—তাহা মাধব পাগলা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীগুরু-দর্শনের জন্য ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"নামের পূর্ব্বে শ্রী যোগ করিয়া বলিতে হয়।"

তখন মাধব পাগলা বুঝিলেন—তাঁহার অপরাধ কোথায়? কারণ লোকে তাঁহার গুরুর নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শ্রী বাদ দিয়া শুধু রাম ঠাকুর বলিতেন। অন্তর্য্যামী গুরু শিষ্যের অপরাধ এক কথায় সংশোধন করিয়া দিলেন। এ রহস্য গুরু শিষ্য ব্যতীত উপস্থিত কাহারও বোধগম্য হইল না।

প্রণামান্তে উঠিয়া ঠাকুরের নিকট বসিবার পর, ঠাকুর মাধব পাগলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?"

মাধব পাগলা এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিজের নাম ধাম ও বংশ পরিচয় সবই বলিলেন। কিন্তু ঠাকুর এই সব শুনিয়া বলিলেন—"চিনিতে পারিলাম না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তি শুনিয়া মাধব পাগলা বুঝিতে পারিলেন, উত্তর ঠিক হইল না। এবং উত্তর যে কি হইবে তাহাও স্থির করিতে পারিলেন না। বোধহয় পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের এইপ্রকার প্রশ্ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাধব পাগলার মাথায় এবং পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—"খুব কষ্ট, ভাল খাওয়া দাওয়া জুটে না, ভাল কাপড় জামা জুতা নাই, অসুখ করিলে ঔষধও জুটে না, খুব অভাব, খুব কষ্ট।"

এই কথা বলিয়া ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন।

মাধব পাগলা শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—আমি ত আমার অভাব অভিযোগের কথা ঠাকুরকে কখনও বলি নাই। তবে ঠাকুর কি করিয়া জানিলেন? জানিয়াও ত ইহার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন না। ইহাতে মনে হয়, ভবিষ্যতে আমাকে যে অভাব অনটনের মধ্য দিয়াই সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে—ঠাকুর যেন তাহারই ইঙ্গিত করিলেন।

৩

শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীধামে হরসুন্দরী ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিতেছেন—এই সংবাদ পাইয়া মাধব পাগলা গুরুদর্শনে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ঠাকুরের শরীর অসুস্থ থাকায় ভক্ত ও শিষ্যদের কাহাকেও ভীড় করিতে দেওয়া হইতেছিল না।

মাধব পাগলা ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণত হইলেন এবং তিনি যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে গীতা শিক্ষা করিতেছেন—তাহা জানাইলেন।

ঠাকুর ধীর শান্তভাবে ইহা শুনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—

আপনি কোন শ্রেণীর লোক ?

মাধব পাগলা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন—ঠাকুর আমার নাম ধাম সবই জানেন তবে এরূপ প্রশ্ন করিতেছেন কেন ? নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন সাধারণ নয়।

মাধব পাগলা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরও আর কিছু না বলায় তিনি প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি তাঁহার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঠাকুরের প্রশ্নটী বলিলেন এবং দুঃখিত অন্তঃকরণে তিনি যে ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই—তাহা জানাইলেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া বলিলেন—উত্তর না দিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছ। প্রশ্নটী সাধারণ নহে। সুতরাং সাধারণ উত্তর দিলে ঠাকুর বুঝিতেন তুমি প্রশ্নটী বোঝ নাই। উত্তর না দেওয়ায় ঠাকুর তোমাকে বুদ্ধিমান বলিয়াই জানিলেন।

নামের প্রভাবে শ্রীগুরু দর্শন

একবার শ্রীশ্রীঠাকুর কাশী আসিয়া বীরেশ্বর পাঁড়ে ধর্ম্মশালায় ৬নং ঘরে আছেন। দুই দিন যাবৎ দুই বেলায় বহু লোক

ঠাকুরের দর্শনে যাইয়া, দরজা বন্ধ থাকায় ঠাকুরের দেখা না পাইয়া, ফিরিয়া আসিতেছেন।

ঠাকুর কাহারও সহিত দেখা করিতেছেন না। তৃতীয় দিবসে সকাল ৯টায় মাধব পাগলা খবর পাইলেন যে, ঠাকুর কাশী আসিয়াছেন এবং বীরেশ্বর পাঁড়ে ধর্ম্মশালায় আছেন, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন না। দরজা বন্ধ আছে। দর্শনার্থীরা ফিরিয়া আসিতেছেন।

এই সংবাদ শুনিয়া মাধব পাগলা মনে মনে ভাবিলেন— গুরুদত্ত যে নাম জীবকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, সেই নাম কি গুরুদর্শন করাইতে পারিবে না? আজ নামের প্রভাবেই গুরুদর্শন করিব। **নাম যদি গুরুদর্শন করাইতে না পারে তবে নামও ছাড়িব, গুরুও ছাড়িব।**

এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া ভক্তিশক্তিচালিত মাধব পাগলা বীরেশ্বর পাঁড়ে ধর্ম্মশালা অভিমুখে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। অন্যান্য ভক্ত ও গুরুভাইরা ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত পথে দেখা হইলে তাঁহারা মাধব পাগলাকে বলিলেন—এখন ঠাকুরের দেখা পাইবেন না; দরজা বন্ধ— ফিরিয়া চলুন।

মাধব পাগলা বলিলেন—আচ্ছা যাই ত, দেখি কি হয়? এই বলিয়া তিনি বীরেশ্বর পাঁড়ে ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলেন। যে ঘরে ঠাকুর ছিলেন সেই ঘরটীর সামনে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন—দরজা খোলা।

মাধব পাগলা আনন্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপদে প্রণত হইলেন। **নামেরই জয় হইল।**

শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা ঠিকুজী তৈয়ারী করিতেছেন, হাতের অক্ষর বেশ সুন্দর, অঙ্কের হিসাবও চমৎকার। এবং বুঝিলেন—ঠাকুর সংস্কৃতও জানেন।

মাধব পাগলা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন—ঠাকুর, আপনি এর পূর্ব্বে আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন (আপনি কোন শ্রেণীর লোক ?) আমি ত সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—**"উত্তর আমি চাই না, উত্তর আপনি নিজে নিবেন।"**

ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে একথা শুনা মাত্র মাধব পাগলার উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ মিলিয়া গেল। তখন মাধব পাগলা বুঝিতে পারিলেন—তিনি কোন শ্রেণীর সাধক ভক্ত তাহা নিজে যাহাতে বুঝিতে পারেন,—সেইজন্য ঠাকুর এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

পরে ঠাকুর ঈষৎ রাগতভাবে বলিলেন—মিথ্যা না বলিলে হয় না ? মিথ্যার ব্যবসা না করিলে চলে না ? কেবল মিথ্যা কথা ?

ঠাকুরের এই তিরস্কারে মাধব পাগলা দুঃখে ও অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এই তিরস্কারের প্রতিবাদে মাধব

পাগলার মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না। পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং বাহির হইবা মাত্র দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

ধর্মশালার বাহিরে রাস্তায় আসিবামাত্র মাধব পাগলা বুঝিতে পারিলেন—ঠাকুর কেন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"হায়! হায়! আমি ত সত্যই মিথ্যাবাদী, ঠাকুর ত ঠিকই বলিয়াছেন। কারণ লোকের মুখে শুনিয়াছি—ঠাকুর ভাত রান্নার কাজ করিতেন, লেখাপড়া জানেন না। একথা আমি ত বহু লোকের নিকট বলিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিলাম ঠাকুরের হস্তাক্ষর কত সুন্দর; এমন সহজ উপায়ে অঙ্ক কষিয়াছেন! ঠাকুর যে ভাল লেখাপড়া জানেন, তা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম। লোকে না জানিয়া ঠাকুরের নামে মিথ্যা প্রচার করিতেছে।"

আজ মাধব পাগলা অনুতপ্তচিত্তে মনে মনে ঠাকুরের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে মাধব পাগলাও অজ্ঞানতাজনিত গুরুনিন্দা মহা পাপ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় মুক্ত হইলেন। এবং শ্রীগুরু দর্শন পাওয়ায় শ্রীগুরু ও নামের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূত হইল।

মাধব পাগলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আনন্দে তাঁহার মাকে বলিলেন—হাঁ মা, ঠাকুরের দেখা পাইয়াছি। তিনি ভালই আছেন।

মাধব পাগলা যে ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছেন, কাশীর অন্যান্য ভক্তগণ কিন্তু একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এমন কি সেইদিন মাধব পাগলার মাও ঠাকুরের দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

পরের দিন মাধব পাগলার মা ঠাকুরের দর্শন না পাওয়ার দুঃখে দুঃখিত হইয়া মাধব পাগলাকে বলিলেন—হাঁরে খোকা! তুইত ঠাকুরকে দেখে এলি, আমি ত কাল ঠাকুরকে দেখতে পেলাম না।

মাধব পাগলা তাঁহার মায়ের গুরুদর্শন না হওয়ার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন—মা, আজ তুমি ঠাকুর দর্শনে যাও, নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শন পাইবে। যদি দরজা না খোলে, তবে আমি দরজা খোলার ব্যবস্থা করিব।

মাধব পাগলার মা এইকথা শুনিয়া পাগলার বন্ধু যদুবাবুকে (৺যদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে লইয়া শ্রীগুরুদর্শনে গেলেন। এবং গিয়া দেখিলেন—দরজা বন্ধ।

ভিতর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতে শুনা গেল—

কে আমায় ডাক্‌ছে, শীগ্‌গীর দরজা খোলেন।

ঠাকুরের এইকথা বলার পর দরজা খুলিয়া গেল।

মাধব পাগলার মা ও যদুবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাইলেন এবং সেইদিন হইতে সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাইতে লাগিলেন।

এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীশ্রীঠাকুর যেন তাঁহার শিষ্য ও ভক্তদের পরীক্ষার জন্যই এই দরজা বন্ধের লীলাটী করিলেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণানুশীলন

১৩৪৬ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীর হরসুন্দরী ধর্ম্মশালায় আছেন এবং বহু শিষ্য ও ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন সন্ধ্যাবেলা শিষ্যদের উপদেশ করিতেছেন এমন সময় মাধব পাগলা ঠাকুরের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং কাছে বসিয়া উপদেশ শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জনৈক শিষ্যকে বলিলেন—আপনি বেশ ভাল ভাবে ৺সত্যনারায়ণ সেবা করিবেন।

আর একজনকে বলিলেন—আপনি ফুল বেলপাতা দিয়া ভাল ভাবে পূজা পাঠ করিবেন।

এই প্রকার এক একজনকে এক এক প্রকার উপদেশ করিতেছিলেন। মাধব পাগলা কিন্তু কাছে বসিয়া শুনিতেছিলেন এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন—"অনেক দিন হইল আমার দীক্ষা হইয়াছে। শাস্ত্রে বলে, গুরুশক্তির দ্বারাই শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। আজ আমি গুরুর নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের শক্তি প্রার্থনা করিব।"

এই চিন্তা করিতে করিতে মাধব পাগলা ব্যাকুল হইয়া অশ্রুপুলকসহ শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে পতিত হইয়া মনে মনে

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের শক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও আজ মাধব পাগলার প্রণত অবস্থায় তাঁহার পিঠে হাত রাখিয়া একটী মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া কি যেন মন্ত্র জপ করিলেন।

মাধব পাগলা বুঝিতে পারিলেন—আজ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদও যেন একটু বিলক্ষণ, কারণ পূর্ব্বে তিনি কখনও এভাবে মাধব পাগলার পিঠে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করেন নাই।

মাধব পাগলা উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া আকুলভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন হইয়া মৃদু মধুর ভাষায় বলিতে লাগিলেন— "আপনি মহোৎসব করিবেন।"

মহোৎসবের কথা শুনিয়া মাধব পাগলা চমকাইয়া উঠিলেন এবং ভাবিলেন—আমি গরীব, মহোৎসব করিবার মত টাকা আমি কোথায় পাইব? ঠাকুর আমাকে একি আদেশ করিতেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন— "চাল ডালের খিচুরী দিয়া নহে, দশ ইন্দ্রিয়, একাদশ মন এই নিয়ে আপনি মহোৎসব করিবেন। তবেই আপনি শান্তি পাইবেন।"

মাধব পাগলা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে এই উপদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এত বড় উচ্চাঙ্গের

ভজন আমার দ্বারা কি সম্ভব ? যদি ঠাকুর শক্তি দেন তবেই সম্ভব হইবে।

মাধব পাগলা শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ পাইয়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন, এবং মনে মনে কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন—ঠাকুর এমন কঠিন উপদেশ কেন করিলেন, আমার দ্বারা ত ইহা সম্ভব নহে।

পরে শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারিলেন—এই উপদেশের তাৎপর্য্যার্থ—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। ইহা একমাত্র গুরুশক্তির কৃপাতেই হওয়া সম্ভব।

তাই শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা-ও মাধব পাগলাকে বলেন—"তোর গুরু তোকে যেমন কৃপা করেছেন, এমন কজন গুরু কজন শিষ্যকে কৃপা করেন ? ঠাকুর যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিস্।"

গুরুতত্ত্ব সাধনার ক্রম বিকাশ

প্রথম ক্রম

সাধন পথে দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া ধীর স্থিরচিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমতঃ শ্রীশ্রীগুরুমূর্ত্তি (ফটো) উত্তম স্থানে বসাইয়া যথানিয়মে ভক্তিসহকারে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা নানা উপচারে (নিজ অভীষ্টমত বা সাধ্যানুসারে) পূজা ও স্তব স্তোত্র পাঠ করিবে।

প্রথম প্রথম দৈহিক ক্লেশ, মানসিক চাঞ্চল্য, বৈষয়িক চিন্তা ইত্যাদি উৎপাত আসিবে। কিন্তু তাহাতে বিচলিত না হইয়া এই সব উপেক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুপূজা সমাপনপূর্ব্বক গুরুমূর্ত্তির প্রতি একদৃষ্টে কিছু-ক্ষণ চাহিয়া ইষ্টমন্ত্র মনে মনে জপ করিবে।

প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুর চরণযুগল দর্শন করিও। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই চরণদ্বয় চিন্তা করিবে। ইহা ধ্যানের প্রথম অভ্যাস বা প্রথম ক্রম।

সাংসারিক কর্ম্মে রত থাকিলেও মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ এবং শ্রীশ্রীগুরুর চরণযুগল সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। জপ সর্ব্বদা চলিবে। ক্রমশঃ চরণদ্বয় হইতে শরীরের উপরের দিকে ভাবিতে চেষ্টা করিবে। কিংবা মুখমণ্ডল হইতে চরণযুগল পর্য্যন্ত ধ্যানের ক্রম অভ্যাস করাও চলে। যে যেভাবে দৃষ্টি রাখিতে পারিবে সে সেই ভাবেই ধ্যানের অভ্যাস করিবে। কিছুকাল অভ্যাসের

ফলে এই অবস্থায় পরিপক্কতা লাভ করিলে দ্বিতীয় ক্রমে পৌঁছিবে।

দ্বিতীয় ক্রম

এই ক্রমে আসিলে শ্রীশ্রীগুরুর পূর্ণাঙ্গরূপ চিন্তা ও সর্ব্বাবস্থাতেই জপ ধ্যান করিবে। এই অভ্যাস দৃঢ় হইলে কানের মধ্যে অবিরত সাঁই সাঁই শব্দ অথবা শঙ্খ ঘণ্টার আওয়াজ কিংবা দূরাগত বংশীধ্বনি শ্রুত হইবে। অশ্রু কম্পন পুলক শিহরণ ইত্যাদি লক্ষণ দেহে প্রকাশ পাইবে। তাহাতে বিচলিত হইও না বা তাহাকে ব্যাধি বলিয়া মনে করিও না। ইহা উত্তম লক্ষণ বলিয়া ধরিও। এবং জপ যে ঠিকভাবে চলিতেছে—ইহা তাহারই প্রমাণ। এইরূপে শ্রীশ্রীগুরুমূর্ত্তির পূর্ণাঙ্গরূপ মানসপটে স্থায়ীভাবে আসিলে জানিবে—মন স্থির হইয়াছে। ইহাই গুরুতত্ত্ব সাধনার দ্বিতীয় ক্রম।

তৃতীয় ক্রম

সাধনার তৃতীয় ক্রমে আসিলে শ্রীশ্রীগুরুর পুর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি চিন্তাসহ জপ করিতে করিতে দেহ শ্রীশ্রীগুরুতে সমর্পণ করিবে।

এই দেহই শ্রীশ্রীগুরুর এবং তিনি তাঁহার ইচ্ছামত দেহকে চালাইবেন। এবং অন্তরে সর্ব্বদা গুরুমূর্ত্তি দর্শন করিবে। তাহাতে বিষয়াসক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইবে। কাম ক্রোধাদি

রিপুর দৌরাত্ম্য কমিতে থাকিবে। মন শান্ত এবং ধীরে ধীরে প্রসন্নতা লাভ করিবে। ক্রমশঃ দেহ হইতে আমিত্ব বুদ্ধি এবং অভিমান হ্রাস পাইতে থাকিবে। সাংসারিক ভয় উদ্বেগ ইত্যাদিও কমিতে থাকিবে। শ্রীশ্রীগুরুশক্তির উপর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকিবে; ফলে শ্রীগুরুকৃপায় গুরুর চিন্ময় সত্ত্বা তোমার অন্তরে প্রকটিত হইবে। গুরুশক্তি দ্বারা তোমার ইন্দ্রিয়াদি এবং দেহমন বুদ্ধি পর্য্যন্ত চালিত হইবে। এবং চিত্ত গুরুশক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইবে। গুরু এবং শিষ্যে অভেদাত্ম্য স্থাপিত হইবে। গুরুর সহিত অভেদাত্ম্যভাব অথবা একাত্মতা প্রাপ্ত হইলে তুমি তোমার সমস্ত দায়িত্ববোধ হইতে মুক্ত হইবে।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ ইত্যাদি সংস্কার আর তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। কারণ তখন তুমি তোমার সমস্ত দায়িত্ব গুরুতে ন্যস্ত করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সুখে বিচরণ করিবে। ভজন জগতের ইহা এক অতীব দুর্লভ ও পরম গুহ্য বস্তু।

এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে রাগানুগ ভজন হওয়া সম্ভব নহে। এই জন্যই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

"শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি"

এই অবস্থায় উন্নীত হইলে শাম্ভবী মুদ্রার প্রয়োগে অখণ্ড নাম জপ ও ধ্যানের পরিপাকান্তে দেহাভিমান সম্পূর্ণভাবে চলিয়া

যাইবে। অর্থাৎ দেহেতে আমি আমার বোধ থাকিবে না। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বর্ণিত নির্দ্বন্দ্ব বা গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

এই অবস্থার পরিপাকান্তে গুরু তোমার দেহে আবেশিত হইয়া তোমার দ্বারা অনেক অলৌকিক বা অদ্ভুত কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন। তাহাকে নিজের ক্ষমতা বলিয়া মনে করিও না, তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে এবং অগ্র-গতি বন্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে। এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

চতুর্থ ক্রম

পূর্ব্ববর্ণিত গুণাতীত অবস্থার পরিপাকান্তে চতুর্থ ক্রমে উন্নীত হইবে। এই চতুর্থ ক্রমের যে ভজন তাহা কেবলমাত্র গুরুশক্তির দ্বারাই হয়। তবে জীবের নিজস্ব সাধন সংস্কার অনুপ্রবিষ্ট থাকে।

সাধকের চিত্তের যোগ্যতা অনুসারে ভাব প্রকাশ পায়। রস সেই ভাবের অনুগত। ভাব অনুযায়ী রস চিত্তে আস্বাদিত হয় এবং ইষ্টে অর্পিত হয়। এই চতুর্থ ক্রমের পরিপক্ক অবস্থায় ইষ্টতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। তখন অখণ্ড জপ ধ্যানের পর সাধকের চিত্তে কেবলমাত্র ইষ্টস্বরূপের অনুভূতি থাকে। এই অবস্থায় সাধক যে আচরণ করেন তাহাকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন বলা হয়। কারণ তখন তার নিজস্ব সত্ত্বা আর থাকে না। ইষ্টসত্ত্বা স্ফুরিত হয় এবং ইষ্টের প্রীতির জন্য তাহার ইন্দ্রিয়াদি কর্ম্মরত থাকে ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি ও জ্ঞান এবং কর্ম্মের সংস্কার ছাড়িয়া ইষ্ট-প্রীতির অনুসন্ধান করিতে থাকে।

এইভাবে আদরের সহিত নিরন্তর দীর্ঘকাল (অর্থাৎ যতদিন দেহ থাকিবে) ভজন করিয়া যাইবে। এই প্রকার ভজন খুব দুর্লভ। ইহাই রাগানুগ ভজনের শেষ পরিণতি।

এই ভজনের প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদিতে গাঢ় ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাহাকে সাধন ভক্তি বলা হয়। সেই ভক্তি আরও গাঢ় হইলে প্রেম ভক্তিতে পরিণত হয়। তখন তাহা একমাত্র হৃদয়েই প্রকটিত হয়।

বাহিরে প্রকাশ ক্বচিৎ, ইহারই নাম—
"নিত্য সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং, হৃদি সাধ্যতা"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অর্থ এই—তখন প্রেম চিত্তে প্রকটিত হইয়া চিত্তেই আস্বাদিত বা সাধিত হয়।

এই অবস্থায় সাধক ইষ্টস্বরূপে স্থিত হইয়া চিন্ময় রস বিগ্রহ বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হয়।

৩২/৭০ পাতালেশ্বর
বারাণসী।
শ্রীশ্রীবাসন্তী দশমী
২৩শে চৈত্র ১৩৬৬

মাধব পাগলা

বিঃ দ্রঃ—শ্রীশ্রীগুরুদেব অবধূত মাধব পাগলা মহারাজের অনুমতি-ক্রমে তাঁহার সাধনার আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ "শ্রীগুরুতত্ত্ব - সাধনের ক্রম" এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইল।

স্বপ্নযোগে গুরুতত্ত্ব সাধনার আরম্ভ

মাধব পাগলা তাঁহার দীক্ষালাভের দ্বিতীয় বর্ষে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছেন—একটি ফুলের বাগানে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। এই বাগানের সামনে একটি ঢালু পাহাড়। পাহাড়টী নানান রঙ বেরঙের সাপে ভর্ত্তি। এই পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া আছেন এক মুক্তকেশী ভৈরবী। চওড়া লাল পাড় গৈরিক রঙের শাড়ী তাঁহার পরিধানে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দুই বাহুতে রুদ্রাক্ষের বলয়। ললাটে উজ্জ্বল বড় সিন্দুরের ফোঁটা; বাম হাতে ত্রিশূল। মুখখানা প্রশান্ত হাসিতে ভরা।

তাহার অনতিদূরে পাহাড়ের উপরে ব্যাঘ্র চর্ম্মোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর আসনের চারি পার্শ্বে সাপ। কণ্ঠদেশে একটি সাপ ও পায়ের নিকটে একটি বড় সাপ শুইয়া আছে।

ভৈরবী ইঙ্গিতে মাধব পাগলাকে নিজের কাছে ডাকিলেন। মাধব পাগলা উত্তর করিলেন, তোমার চারপাশে সাপ—কেমন করে যাই ?

ভৈরবী প্রসন্নমুখে বলিলেন—ভয় নাই, তুই আমার কাছে আয়। সাপে তোকে কিছু করবে না।

ভৈরবীর এই কথা শুনিয়া তিনি ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলেন। সাপগুলি ক্রমশঃ সরিয়া গিয়া রাস্তা করিয়া দিল।

তিনি ভৈরবীর নিকট অগ্রসর হইতে হইতে অবাক বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন—তাইত, সাপ আমাকে কামড়াচ্ছে না ত? বরং রাস্তা করে দিচ্ছে। এ'ত দেখছি এক অদ্ভুত ব্যাপার।

ভৈরবীর নিকট গিয়া দাঁড়াইতেই ভৈরবী সস্নেহে মাধব পাগলার মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পরে ইঙ্গিতে—উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন—যাও, প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসো।

ভৈরবীর আদেশে মাধব পাগলা সন্ন্যাসীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সাপগুলি সরিয়া যাইতে লাগিল। তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে সন্ন্যাসীর পায়ের নিকট আসনে শায়িত বড় সাপটী সরিয়া গেল। তিনি সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মাধব পাগলা সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে ভৈরবীর দিকে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন—কই? সন্ন্যাসীর গলায় ফণাধর সাপটীত আমাকে দংশন করিল না। কাহার প্রভাবে ইহা সম্ভব হইল। ইহাই ভাবিতেছিলেন এমন সময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

মাধব পাগলার নিকট এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন—বিষয় ও বিষয়াসক্তিই—সাপ এবং বিষ। শিবশক্তির কৃপা ব্যতিরেকে বিষয় ও বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। বিষয়মুক্ত এবং আসক্তিশূন্য না হইলে রাগানুগ ভজন হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই স্বপ্নের দ্বারা আমাকে তাহাই বুঝাইয়া দিলেন।

এই স্বপ্ন দেখার কয়েক মাস পরে কাশীর দেবনাথ পুরার শর্বশিবা মন্দিরের পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া মাধব পাগলার মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

গুরু ও শিষ্যে অভেদ ভাব

(প্রত্যক্ষ)

মাধব পাগলার দীক্ষালাভের আনুমানিক চার বৎসর মধ্যে গুরু ও শিষ্যের অভেদ ভাবের একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটে। তখন তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়াছেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। ছাত্র পড়াইয়া মাসে ১৫৲ পনের টাকা আয় করেন। সংসারে মা আছেন, বড় কষ্টে দিন চলে। ডাল, ভাত, শাক এক বেলা খান আর তিনি নিজে রাত্রে এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া খান। ছেঁড়া কাপড় পরিয়া তাঁহার মা ও তিনি কোন রকমে দিন কাটাইতেন। সন্তানের আরাধ্যা গর্ভধারিণী জননীকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে না পারায় তিনি মনে খুব দুঃখ পাইতেন।

রাত্রিতে মায়ের একটু জল খাবারের ব্যবস্থা করিতে না পারায় লজ্জায় ঘৃণায় এবং দুঃখে অনেক সময়ে চোখে জল আসিত।

এই অভাবের তাড়নায় প্রতিদিন রাত্রে খুব কাঁদিতেন। কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়া ফেলিতেন। এ কান্না কেউ জানে না।

ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া কাঁদিতেন আর মনে মনে বলিতেন—ঠাকুর! তুমি থাকিতে আমার এত দুঃখ! এ দুঃখ তোমাকে ছাড়া আর কাহাকে বলিব?

একদিন বৈকালবেলা মাধব পাগলা কাশীর ঘোড়াঘাটে বেড়াইতে বেড়াইতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি গরীব। সেইজন্য ঠাকুর হয়ত আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর বড়লোকদের বাড়ীতে থাকেন। এমতাবস্থায় আমার মত গরীবকে তাঁহার মনে না রাখাই সম্ভব।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, গুরু আশ্রিত মাধব পাগলার চিত্তে, গুরুর প্রতি এক বিচিত্র ধরণের অভিমান উপস্থিত হইল, এবং ক্ষোভে দুঃখে মাধব পাগলার শরীরটা অবশ হইয়া গেল। তিনি (সেই দিনের বেলায় এত লোকের মধ্যেও) ঘাটের সিঁড়ির উপর ভিখারীর মত বসিয়া পড়িলেন। সেই স্থানটীতেই ভিখারীরা ভিক্ষা করিতে বসিত। মাধব পাগলার লজ্জা ধৈর্য্য কিছুই রহিল না। তিনি বালকের ন্যায় হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে, তাঁহার কান্না বন্ধ হইলেও, গুরুর প্রতি অভিমান এবং দারিদ্র্যের পেষণে—তিনি তাঁহার সারা অন্তরে এক অব্যক্ত জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, দশাশ্বমেধে যাইবার সময়, বাঙ্গালীটোলা গলির মধ্যে, মাধব পাগলার গুরুবোন শিবদুর্গার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই শিবদুর্গা তাঁহার বাল্যকালের খেলার সাথী।

শিবত্বর্গার পিত্রালয় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় বিদগাঁও গ্রামে। পাগলার মাতুলালয়ের পাশের বাড়ী। মাধব পাগলার মায়ের সহিত শিবত্বর্গার মায়ের বিশেষ প্রীতিভাব ছিল। পাগলার মাতা ঠাকুরাণী শিবত্বর্গাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন ; কারণ শিবত্বর্গা বাল্যে তাঁহার স্তন্য পান করিয়াছিলেন।

শিবত্বর্গা তাঁহার বিবাহের পর ঘর সংসার করিতে স্বামীগৃহে চলিয়া যান। মাধব পাগলা তাহার বহু পূর্ব্বেই বিক্রমপুর পরগনার তেলিরবাগ গ্রামে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পৈত্রিক বাড়ীতে স্থাপিত কে, এম, ডি, এম, ইনষ্টিট্যুইসান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই বিচ্ছেদের পর দীর্ঘকাল তাঁহাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ প্রায় বাইশ বৎসর পরে তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইল।

মাধব পাগলা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন এবং বলিলেন—তুই ত সাধু হয়েছিস্।

শিবত্বর্গা হাসিয়া বলিলেন—তুইও সাধু।

মাধব পাগলা : তুই কোথায় গিয়ে সাধু হয়েছিস্ ?

শিবত্বর্গা : তুই যেখানে—আমিও সেখানে।

মাধব পাগলা : তবে কি তুই ঠাকুরের নিকট দীক্ষা নিয়েছিস্ ?

শিবত্বর্গা বলিলেন—ঠাকুরই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। বিকেলবেলা বাড়ীতে থেকো। তোমার সাথে অনেক কথা আছে। আমি বেলা ৪টার সময় তোমার

বাসায় যাব। এখন শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ ও ৺অন্নপূর্ণা দর্শনে যাইতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর যে শিবত্বর্গাকে মাধব পাগলার নিকট পাঠাইয়াছেন—এইকথা শুনিয়া তিনি অবাক হইলেন। কিন্তু এ ঘটনার ভিতরের রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বাসায় আসিয়া মাকে শিবত্বর্গার আসার সংবাদ দিলেন।

বিকালবেলা শিবত্বর্গা মাধব পাগলার বাসায় আসিলে, তাঁহার মা শিবত্বর্গাকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন। কিছু-ক্ষণ পাগলার মায়ের সহিত কথাবার্ত্তার পর, শিবত্বর্গা পাগলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁরে, ঠাকুর সম্বন্ধে তোর কি ধারণা? শিবত্বর্গার এই প্রশ্নে মাধব পাগলার চিত্তে ঠাকুরের উপর সেই আগের অভিমান জাগিয়া উঠিল।

পাগলা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—ঠাকুর বড়লোকদের। গরীবদের জন্য নয়!

এইকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অভিমানবশতঃ মাধব পাগলার কান্নার ভাব আসিল।

শিবত্বর্গা এই কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—ছিঃ! একথা কি বলতে হয়? বি, এ পাশ করা মুখ্যু?

মাধব পাগলা বলিলেন—কেন মুখ্যু কিসে? আমিত সত্য কথাই বলেছি।

উত্তরে শিবত্বর্গা বলিলেন—ঠাকুর প্রত্যহ তোর কান্নায় অস্থির হইয়া উঠেন এবং বলেন, আমাকে কেঁদে জ্বালাচ্ছে।

সেইজন্যই আমাকে তোর কাছে পাঠিয়েছেন ! আর তুই মনে করিস—ঠাকুর বড়লোকদের !

মাধব পাগলা বলিলেন—হাঁরে, ঠাকুর যে ঘরে আছেন সেই ঘরটা কি গ্রীন রঙের ? ঘরের দেওয়ালে কি লতাপাতা আঁকা ? ঠাকুরের বিছানার চাদর এবং বালিশ কি সব গ্রীন রঙ্গের ?

শিবদুর্গা বলিলেন—হাঁ। ঠাকুরের চোখ অপারেশন হয়েছে। চিকিৎসা চলছে। তাই সেখানকার সব গ্রীন রঙ্গের। ঠাকুর কোথায় আছেন—তা'ত তুই জানিস্ না, তবে তুই এসব কি করে দেখলি ?

মাধব পাগলা হাসিয়া বলিলেন—ঠাকুরকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখলেই এসব দেখতে পাওয়া যায়।

শিবদুর্গা এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ানন্দে ও বাৎসল্যস্নেহে মাধব পাগলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং সান্ত্বনার সুরে বলিলেন —"হাঁরে, এরপরও ঠাকুরের উপর অভিমান ! ঠাকুর মধ্যে মধ্যে রাত্রে চিৎকার করিয়া বলেন—দেখ আমাকে কেঁদে জ্বালাচ্ছে। আমরা ঠাকুরকে বলিলাম—এখানে ত কেউ নেই তবে কে আপনাকে কেঁদে জ্বালাচ্ছে ? উত্তরে ঠাকুর আমাদের বলিলেন—এখানে নয়, কাশীতে গোপাল কেঁদে কেঁদে আমাকে জ্বালাচ্ছে। যাও, কাশী গিয়ে তাকে শান্ত কর, নইলে আমি স্থির থাকতে পারছি না। তাই ঠাকুরের আদেশে এসেছি।"

"তোমার কান্নায় তিনি কাঁদেন, তোমার কান্নায় তাঁর বড় কষ্ট হয়। ঠাকুর বলে দিয়েছেন—

গোপালকে বলো, অভাবে পড়লেই কি কাঁদতে হয় ?"

এই কথা শুনিয়া মাধব পাগলা বিস্মিত ও হতবাক্ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—তবে ত ঠাকুর আমার সব খবরই জানেন।

পাশের ঘরের এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে "তারা মা" বলিয়া ডাকিতেন এবং খুবই স্নেহ করিতেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েকমাস পূর্ব্বে উক্ত তারা মা মাধব পাগলার গর্ভধারিণী জননীকে বিনা দোষে গাল মন্দ করায়, মাধব পাগলার সহিত তাঁহার ঝগড়া হয়।

মাধব পাগলার মাতা পাগলাকে উক্ত তারা মার নিকট ক্ষমা চাহিতে বলায় পাগলা তাঁহার মাকে বলিলেন—অযথা সে তোমাকে গালমন্দ করিয়াছে, আমি ক্ষমা চাহিব কেন ?

এই ঘটনায় তারা মার সহিত তাঁহাদের বাক্যালাপ ও আসা যাওয়া এতদিন বন্ধ ছিল। মধ্যে মধ্যে মাধব পাগলার মনে ভয়ের সঞ্চার হইত। কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুর তারা মাকে খুবই স্নেহ করিতেন। মাধব পাগলার ধারণা—ঠাকুর যখন ইঁহাকে খুবই স্নেহ করেন, আর আমি ইহার সহিত ঝগড়া করিয়াছি—এ কথা যদি ঠাকুর জানিতে পারেন, তবে তিনি আমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হবেন। এইরূপ আশঙ্কা মধ্যে মধ্যে মাধব পাগলার মনে জাগিত।

শিবত্বর্গা তারা মায়ের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। তারা মা শিবত্বর্গাকে বলিলেন—হ্যাঁরে ত্বর্গা, কবে এলি? ঠাকুরের খবর কি? আমায় ঘরে চল—একটু জল খাবি।

শিবত্বর্গা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন—না, আপনার ঘরে গিয়া জল খাওয়া হবে না। কারণ ঠাকুর বলিয়া দিয়াছেন—

"তারা মার সহিত আমার ঝগড়া। কিন্তু গোপাল যদি বলে তবেই সেখানে যাইয়া জল খাইও।"

শিবত্বর্গার এই কথা শুনিয়া, ঠাকুরের উপরোক্ত ভঙ্গীতে কথা বলার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ মাধব পাগলা অনুতপ্তচিত্তে, তারা মাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং উভয়ে গিয়া তারা মার ঘরে জলযোগ করিলেন।

জলযোগের পর শিবত্বর্গা তারা মাকে ঝগড়া বিষয়ে ঠাকুর যাহা বলিয়া দিয়াছেন—তাহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া সেদিনকার মত বিদায় হইলেন।

মাধব পাগলা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—তারা মার সহিত আমি ঝগড়া করিয়াছি; ঠাকুরের সহিত তাঁহার ঝগড়া কি করিয়া হইল? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে বুঝিলেন, **এই দেহ মন বাক্যের দ্বারা যাহা করা যায় তাহা সবই ঠাকুরেরই করা হয়। কারণ এই শরীরের উপর শ্রীশ্রীগুরুরই অধিকার।**

সেইজন্য ঠাকুর বলিয়াছেন—তারা মার সহিত আমার ঝগড়া। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন মাধব পাগলার মাধ্যমে তারা মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মাধ্যমে কথার তাৎপর্য্য এই যে, যে দেহের দ্বারা অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ঠাকুর সেই দেহ দ্বারাই ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া লইলেন।

এই ঘটনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় মাধব পাগলা তাঁহার সাধন জীবনে এক অপূর্ব্ব তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন এবং আরো ভাবিতে লাগিলেন—

এই দেহের দ্বারা যাহা কিছু কাজ অনুষ্ঠিত হয়, সবই যখন ঠাকুরেরই করা হয়, তখন এই দেহদ্বারা কোনরূপ অন্যায় বা পাপ করা হইবে না। তাহা হইলে ঠাকুরকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

উক্ত ঘটনার পর হইতে, মাধব পাগলার দেহ মন ক্রমশঃ সংযত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার আচার ব্যবহারেও এক পরিবর্ত্তন প্রকাশ পাইল।

এই ঘটনাটি গুরু শিষ্যের অভেদ ভাবের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গুরু ও শিষ্যে অভেদ ভাব
(স্বপ্নযোগে)

মাধব পাগলার মন্ত্রসিদ্ধির পর, ভাব সমাধি অবস্থায়, তাঁহার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে যখন উপদেশ পাইতেছিলেন, সেই সময় একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—বর্ষাকাল। মাঠ ঘাট সব জলে ডুবিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাধব পাগলা নৌকায় যাইতেছিলেন।

নৌকায় তিনি ভাত রান্না করিয়া আলুসিদ্ধ ভাত শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিলেন।

খাইতে খাইতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাধব পাগলাকে বলিলেন—এসো, তুমি আমার সঙ্গে বসিয়া খাও। ঠাকুরের এই আদেশে মাধব পাগলা সঙ্কোচিত হইয়া বলিলেন—"সে কি ঠাকুর? আপনি গুরু, আমি শিষ্য। আপনার সঙ্গে এক থালায় বসিয়া কি করিয়া খাইব?"

শ্রীশ্রীঠাকুর খাইতেছেন, এমন সময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

পরের দিন মাধব পাগলা তাঁহার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বলিলেন—দাদা! গত রাত্রে আমি এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বপ্নে আমাকে তাঁহার সহিত এক সঙ্গে আহার করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু আমি সাহস করিয়া তাঁহার সহিত খাইতে পারিলাম না। আমার মনে হয়, গতকাল ঠাকুরের ভোগ দেওয়ার সময় নিশ্চয় কোন অপরাধ হইয়াছে। তাহা না হইলে আমি এই রকম দুঃস্বপ্ন কেন দেখিলাম?

তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, এটা দুঃস্বপ্ন নয়। স্বপ্নে গুরুর সহিত এক সঙ্গে বসিয়া খাওয়ায় কোন দোষ নাই। মাধব পাগলা সেইদিন রাত্রেও পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় স্বপ্ন দেখিলেন—পূর্ব্ব-বর্ণিত হুবহু একই পরিবেশে ভাত রান্না করিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিলেন। ঠাকুর আহারে বসিয়া মাধব পাগলাকে বলিলেন—এসো তুমি আমার সঙ্গে বসিয়া খাও।

ঠাকুরের এই আদেশে মাধব পাগলা সেদিন একটু সঙ্কোচের সহিত ঠাকুরের সঙ্গে এক পাত্রে খাইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে মাধব পাগলার জল খাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সেখানে মাত্র একটী জলের গ্লাস। মাধব পাগলা সেই গ্লাসে জল খাইতে দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। কারণ ঠাকুর ঐ গ্লাসে কি করিয়া জল খাইবেন! ইহাই ছিল তাঁহার দ্বিধার কারণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—জল খাও।

মাধব পাগলা তখন ঠাকুরকে বলিলেন—আমি জল খাইলে, আপনি ঐ গ্লাসে কি করিয়া জল খাইবেন?

ঠাকুর বলিলেন—আমি ঐ গ্লাসেই জল খাইব। তুমি খাও।

ঠাকুরের এই আদেশে মাধব পাগলা জল খাইলেন কিন্তু মনে একটা খুঁতখুঁত ভাব লাগিয়াই রহিল।

আহারান্তে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

পরের দিন মাধব পাগলা তাঁহার শিক্ষাগুরুর নিকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন—

ঠাকুরকে পর ভাবিতেছ কেন? ঠাকুর আর তুমি যে অভেদ—স্বপ্নের দ্বারা ঠাকুর ইহাই তোমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ইহা দুঃস্বপ্ন নহে; ইহা সুস্বপ্ন। গুরু কৃপাতেই ইহা হয়।

মাধব পাগলা দীক্ষা গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে স্বপ্নযোগে গুরু শিষ্যে এই অভেদভাব দর্শন হয়।

গুরু ও শিষ্যে অভেদ ভাব

(প্রত্যক্ষ)

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীধামে হরসুন্দরী ধর্ম্মশালায় উঠিলেন। তাঁহার আসার সংবাদ পাইয়া মাধব পাগলা শ্রীগুরুদর্শনে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। সেই সময় ঠাকুর কাশীর একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে (ঠাকুরেরই শিষ্য) 'গুরু ও ইষ্ট'পূজা বিধি সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছিলেন।

মাধব পাগলা তাঁহার উপদেশ প্রাপ্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না করিয়া, চুপ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, উপদেশ শুনিতেছিলেন এবং পূজাবিধি, নিয়মানুষ্ঠানের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন—আমার দ্বারা এরূপ বিধি নিষেধ পালন করা সম্ভব নহে। ইহা ত বড়ই কষ্টসাধ্য !

ঠাকুর উপদেশ শেষ করিয়া ধীর ও শান্তভাবে মাধব পাগলাকে বলিলেন—**আপনি আমার নাম করিয়া যাহা হাতে লইবেন তাহাই আমি পাইব। মনে রাখিবেন—তাহা আমারই নেওয়া হইবে।**

উপরোক্ত ভদ্রলোকের সম্মুখে মাধব পাগলা এরূপ উপদিষ্ট হওয়ায় তিনি বার বার পাগলাকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে মাধব পাগলাকে পূজাপাঠের বিধি নিষেধে আবদ্ধ না করিয়া উক্তভাবে ঠাকুরকে দ্রব্যাদি নিবেদনের সহজ উপায়টী উপদেশ করিলেন—তাহাতে পাগলা বিশেষ আনন্দিত হইলেন

এবং হৃষ্টচিত্তে গুরুচরণে প্রণত হইয়া বিদায় হইলেন। ইহাই তাঁহার সাক্ষাতভাবে শেষবার শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ এবং উপদেশ প্রাপ্তি। ইহার পরে গুরু আবেশিত অবস্থায় এবং স্বপ্নযোগে অনেক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত কথার তাৎপর্য্য কী?—তাহা বাবাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

তদুত্তরে বাবা বলেন—ইহাই গুরুতাদাত্ম্য প্রাপ্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ। ঠাকুর ইঙ্গিতে আমাকে তাহাই বুঝাইয়া দিলেন।

তত্ত্বটী আমাদের নিকট যাহাতে সহজ বোধগম্য হয় তাহার জন্য বাবা একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন। ঘটনাটী প্রত্যক্ষ এবং তাহা নিম্নরূপ :—

ইং ১৯৩৯ সালে একদিন মাধব পাগলা ৺যদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এলোপ্যাথিক ঔষধের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দোকানটীর নাম—ব্যানার্জী কোম্পানী, চক্ বাজার, বেনারস।

তখন বেলা আন্দাজ ১০টা। যদুবাবু দোকানে বিশেষ চিন্তিত ও বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। মাধব পাগলা বলিলেন—কি এত বিষণ্ণ কেন? ব্যাপার কি?

যদুবাবু বলিলেন—আজ সকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত মাত্র চারি আনার ঔষধ বিক্রয় হইয়াছে। দোকানের বিক্রী বাট্টা না

থাকিলে সংসার কি করিয়া চলিবে—তাহাই চিন্তা করিতেছি। (উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় দোকানে প্রত্যহ আনুমানিক বিক্রী ৪০।৫০ টাকা।)

মাধব পাগলা হাসিয়া উত্তর করিলেন—আমার ঠাকুরকে পেয়ারা খাওয়ান তাহা হইলে বিক্রী হইবে।

যতুবাবু এই সব ব্যাপার বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর, তিনি দোকানের চাকরকে দিয়া /০ আনায় তুইটী বড় পেয়ারা আনাইয়া, মাধব পাগলার হাতে দিয়া বলিলেন—এই নিন, বাড়ী গিয়া আপনার ঠাকুরকে ভোগ দিন।

মাধব পাগলা বলিলেন—ঠাকুরকে পেয়ারা খাওয়াইবার জন্য বাড়ী যাইতে হইবে না। এখানে বসিয়াই ঠাকুরকে পেয়ারা খাওয়াইব।

এই বলিয়া পেয়ারা তুইটী জলে ধুইয়া এবং ছুরি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলেন। টেবিলের উপর একখানা কাগজ রাখিয়া, নুন মাখাইয়া, তুই ভাগ করিয়া, এক ভাগ যতুবাবুকে দিলেন, আর এক ভাগ নিজে খাইতে লাগিলেন।

যতুবাবু মাধব পাগলার এই কাণ্ড দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন—মিথ্যা বলিয়া ঠাকুরের নাম করিয়া এই পেয়ারা খাওয়ার কি দরকার ছিল? এই পেয়ারা আপনি বাড়ী গিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলে হইত। আপনার যদি খাওয়ার এতই

ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে বলিলেই ত আমি আপনাকে পেয়ারা কিনিয়া খাওয়াইতাম।

মাধব পাগলা বলিলেন—ঠাকুর খাইয়াছেন। আপনি প্রসাদ খান।

যতুবাবু পেয়ারা খাইতে খাইতে ঈষৎ রাগতভাবে কহিলেন—ঠাকুর যে খাইয়াছেন তাহা কি করিয়া বুঝিব। আপনি শিক্ষিত এবং সাধু বলিয়া নিজেকে প্রচার করিতেছেন। সুতরাং আপনার এই প্রকার ভণ্ডামী দেখিয়া, আপনার প্রতি আমার অশ্রদ্ধাই জন্মিল। আপনি বলিলেই ত, আপনাকে পেয়ারা কিনিয়া খাওয়াইতাম। আমার সহিত এই প্রকার জুয়াচুরি কেন করিলেন ?

মাধব পাগলা কিন্তু যতুবাবুর এই তিরস্কার গ্রাহ্য না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ঠাকুরের প্রসাদ ত খান, প্রমাণ নিশ্চয়ই পাইবেন। দোকানের বিক্রী যদি ভাল হয় তবে ত মানিবেন যে, ঠাকুর আপনার পেয়ারা খাইয়াছেন।

যতুবাবু ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন—হাঁ, আজ যদি আমার দোকানের বিক্রী ভাল হয় তবে মানিয়া লইব ঠাকুর পেয়ারা খাইয়াছেন। যদি প্রয়োজন বোধ করেন তবে আমি পুনরায় পয়সা দিতেছি। আপনি পেয়ারা কিনিয়া লইয়া যান, বাড়ীতে ঠাকুরকে ভোগ দিবেন।

মাধব পাগলা বলিলেন—না, তাহার আর দরকার হইবে না। ঠাকুর এই পেয়ারাই গ্রহণ করিয়াছেন।

বেলা তখন প্রায় ১১টা। সকালে যে চার আনা বিক্রী হইয়াছে, তাহার পর আর কোন বিক্রয় হয় নাই। এমন সময় যদুবাবুর ছোট ভাই মতিবাবু দোকানে আসিলেন। যদুবাবু ও মাধব পাগলা স্নানাহারের জন্য বাড়ী রওনা হইলেন। বাড়ী যাইবার পথে যদুবাবু মাধব পাগলাকে বলিলেন—বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকাল আর সাধু দেখিতে পাওয়া যায় না। সব সাধুই দেখিতেছি—শিক্ষিত ভদ্রবেশধারী বেইমান ও জুয়াচোর।

মাধব পাগলা যদুবাবুর এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়াও যদুবাবুর মানসিক দুশ্চিন্তার কথা বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

যদুবাবু স্নানাহার সমাপনের পর, বিশ্রাম করিয়া, বেলা আন্দাজ ৪টার সময় পুনরায় দোকানে যাইয়া দেখিলেন, দোকানে আর এক পয়সাও বিক্রয় হয় নাই।

তিনি দোকানে যাইবার কিছুক্ষণ পরেই খরিদ্দারের ভীড় আরম্ভ হইল। বেলা ৪॥ টা হইতে আনুমানিক রাত্রি ৮॥ টার মধ্যে ১২২৲।১২৩৲ টাকার ঔষধ বিক্রয় হইল। এদিকে মাধব পাগলা ঠাকুরের পেয়ারা খাওয়ার প্রত্যক্ষ ফলাফল দেখিবার জন্য, রাত্রি আন্দাজ ৯টার সময় দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেখিতে পাইলেন যদুবাবু সিগারেট খাইতেছেন ও হাসি হাসিমুখে এক খরিদ্দারের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

দূর হইতে এ দৃশ্য দেখিতে পাইয়া মাধব পাগলা বুঝিলেন, কার্য্য সফল হইয়াছে। বিক্রয় নিশ্চয়ই ভাল হইয়াছে। মাধব পাগলা দোকানে ঢুকিতেই উক্ত খরিদ্দার বিদায় হইলেন।

মাধব পাগলা যতুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ? ঠাকুর পেয়ারা খাইয়াছেন ত ?

যতুবাবু হর্ষ বিস্ময়ে বলিলেন—আজ এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছে। প্রায় ৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমার প্রায় ১২৩ টাকা বিক্রী হইয়াছে। এত ভাল বিক্রী আমার ছ মাসের মধ্যেও হয় নাই।

মাধব পাগলা গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহাতে আপনার কত টাকা লাভ হইয়াছে মনে করেন ?

যতুবাবু বলিলেন—আনুমানিক প্রায় ত্রিশ টাকা আমার লাভ হইয়াছে। কারণ খুব ভাল দামেই ঔষধ বিক্রয় করিয়াছি।

যতুবাবুর কথায় মাধব পাগলা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—আশা করি, ভবিষ্যতে আমার ঠাকুর সম্বন্ধে আর কোনরূপ অন্যায় মন্তব্য করিবেন না। আপনারা ভুল বশতঃ সাধুকে বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকেন। যথার্থ সাধুর দর্শন পাওয়ার ভাগ্য থাকা চাই এবং চিনিতে পারার যোগ্যতা প্রয়োজন। আর একথাও জানিবেন—মাধব পাগলা বেইমান ও জুয়াচোর নয়। সাধুকে অসাধু মনে করিয়া অবজ্ঞা করিলেই অবজ্ঞা-কারীরই অনিষ্ট হয়।

এই ঘটনাটী গুরু তাদাত্ম্য প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাবা বলিলেন—এই অবস্থায় গুরু শিষ্যে অভেদভাব স্থাপিত হওয়ায় শিষ্যের দেহাদি দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়—তাহা গুরুরই করা হয়।

শ্রীগুরুতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায় এবং সমস্ত দায়িত্ব শ্রীগুরুতে অর্পিত হওয়ায় ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সম্বন্ধে সে নিরপেক্ষ হইয়া যায়। সাধকের পক্ষে শ্রীগুরুতাদাত্ম্য এক অপরিহার্য্য আদরের সম্পদ। কিন্তু ইহা অতীব দুর্লভ।"

---

* এই ঘটনা হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি যদুবাবুর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। এই যদুবাবুই মাধব পাগলার প্রথম জন্মের পিতা। যদুবাবু অপুত্রক থাকায়, পুত্র কামনা করিয়া, পুরীধামে যাইয়া, ধর্ণা (হত্যা) দেন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের কৃপায় মাধব পাগলাকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

এই বিষয় এই গ্রন্থের "মাধব পাগলার নয় জন্মের স্মৃতি লাভের বিবরণ" অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অবধূত মাধব পাগলা

অবধূত মাধব পাগলার

শ্রীগুরুতত্ত্ব সাধন

শিক্ষাগুরু শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও মাধব পাগলা

(অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দর্শনলাভ ও গীতা শিক্ষা)

১

আমি একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দর্শন লাভ কোথায় এবং কি করিয়া পাইলেন ?

বাবা বলিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাতেই আমি এই কাশীধামেই এক আশ্চর্য্য উপায়ে শিক্ষাগুরুর দর্শন লাভ করি। এবং তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারি।

আমার মন্ত্রসিদ্ধির পর আমার দেহ মনে একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে থাকি। মন সর্ব্বদাই যেন উদাসীন। দেহ মন হাল্কা। মাটির উপর দিয়া হাঁটিতে ইচ্ছা হয় না, হাওয়ায় উড়িতে পারিলেই যেন ভাল হয়। সাধারণ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। এবং সর্ব্বোপরি বৈষয়িক কাজকর্ম্মে কোন রকমে মন লাগাইতে পারিতেছি না। অর্থাৎ দেহ মনের অবস্থাটা আমি যেন ঠিকভাবে বুঝিতে পারিতেছিলাম

না। এই সময় আমার বিশেষ পরিচিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের সহিত যখন কথা বলিতাম—জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করিতাম। অন্য কথা বলিতে ভাল লাগিত না। বন্ধুবান্ধবেরা আমার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় আমাকে ঠাট্টা এবং বিদ্রূপ করিয়া বলিত—এদিকে ত সাধু সাধু ভাব দেখাইতেছ, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রত কিছুই পড় নাই বা জান না। যাহা কিছু বল, সবই ত তোমার নিজের ভাষায় এবং নিজের কথায় বল। সুতরাং তোমার এইসব কথা সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমরা কি করিয়া মানিব ?

বন্ধুদের এই কথায় মনে মনে খুবই দুঃখিত হইতাম এবং নিজের অজ্ঞতার জন্য অনুতপ্ত চিত্তে নিজেকে ধিক্কার দিতাম। কারণ তাহাদের কথা খুবই সত্য ; আমি ত জীবনে কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করি নাই।

এই সময় একদিন স্বামী নিখিলানন্দজীর সহিত কাশীর ঘোড়া ঘাটের গঙ্গার ধারে বসিয়া "সংন্যাস এবং সন্ন্যাসী" সম্বন্ধে উপদেশ শুনিতেছিলাম। স্বামিজী আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন ; এই জন্য নির্ভয়ে এবং সরলভাবে মধ্যে মধ্যে স্বামিজীর কথার প্রতিবাদও করিতেছিলাম। স্বামিজী আমার প্রতিবাদে সন্ন্যাসীদের প্রতি একটু অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া, একটু বিরক্ত হইয়াই ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—গোপাল ! তোমার কিন্তু এ সব বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশকালে বলিয়াছেন যে—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"

অর্থাৎ সন্ন্যাসীরাই গৃহস্থের গুরু। তাঁহাদিগকে নারায়ণ জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে হয়।

স্বামিজীর মুখে "উদ্ধব" এই নাম শুনিয়া আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—স্বামিজী, উদ্ধব কে?

স্বামিজী আমার এই অজ্ঞতায় দুঃখিত হইয়া একটু শ্লেষ-মিশ্রিত তিরস্কারের সুরে বলিলেন—গোপাল! এদিকে ত সাধু হওয়ার চেষ্টা করছ, কিন্তু উদ্ধব কে?—তাই জান না। ভক্তমধ্যে উদ্ধব প্রধান। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের মধ্যে উদ্ধবই তাঁহার প্রধান ভক্ত বা শিষ্য।

স্বামিজীর এই স্নেহ মিশ্রিত তিরস্কার আমাকে আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু মন আমার তীব্র অনুশোচনায় ভরিয়া গেল। বন্ধুবান্ধবের ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং স্বামিজীর এই তিরস্কার যেন আমাকে পাগল করিয়া তুলিল।

মনে মনে কেবলই ভাবিতে লাগিলাম—আমিত সত্যই মুর্খ এবং অজ্ঞ। ধর্ম্ম বিষয়ক আমি ত কিছুই পড়ি নাই। এমন কি যে গীতা অনেকেই পড়ে এবং কেহ কেহ মুখস্থও বলিতে পারে তাহা কিন্তু আমি মোটেই পড়ি নাই।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে নিজের উপর একটা ধিক্কারের ভাব জাগিয়া উঠিল। কেবলই ভাবিতাম, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; অথচ গীতা পড়িতেও পারি না, জানিও না। ইহা

বাস্তবিক এক লজ্জার বিষয়। নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর ও ইষ্টের উপর অভিমান করিতাম কেন তাঁহারা আমাকে পণ্ডিত করিলেন না। কখনও বা দুঃখে অপমানে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং জানাইতাম—হায় ঈশ্বর! যদি ব্রাহ্মণই করিলে তবে আমাকে জ্ঞানী করিলে না কেন? মূর্খ করিয়া রাখিলে কেন? এই সব ভাবিতে ভাবিতে গীতা পড়িবার একটা তীব্র তৃষ্ণা আমাকে পাইয়া বসিল। দিন-রাত কেবল ভাবিতাম—কোথায় কাহার নিকট যাইয়া গীতা পড়িতে পারিব, কয়েক দিন পর্য্যন্ত সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলাম।

একদিন কথা প্রসঙ্গে স্বামী নিখিলানন্দজীকে বলিলাম—স্বামিজী! আপনি যদি একটু দয়া করিয়া আমাকে গীতা পড়ান, তাহা হইলে খুব ভাল হয়।

স্বামিজী বলিলেন তাঁহার বয়স হইয়াছে এবং সময়ও কম, সুতরাং তিনি পারিবেন না।

স্বামিজীর উত্তরে দুঃখিত এবং নিরাশ হইয়াও আরও দু চার জনের নিকট এ বিষয় উত্থাপন করিলাম। আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, বিনা প্রণামীতে আমাকে গীতা পড়াইতে কেহই রাজী হইলেন না। অগত্যা নিরুপায় হইয়া কেবলই শ্রীশ্রীঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলাম—ঠাকুর! আমাকে গীতা পড়াইয়া পণ্ডিত ও জ্ঞানী করিয়া দাও। এ দুঃখ ও লজ্জার কথা আর অন্য কাহাকে জানাইব?

২

এই অবস্থায় একদিন বিকালের দিকে দশাশ্বমেধ ঘাটের কালী মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলাম—একজন ভদ্রলোক, গৌরবর্ণ, সুপুরুষ; আনুমানিক ৪০ বৎসর বয়স, আমার অপেক্ষা ৪।৫ বৎসরের বড়। সাদা ধুতি পরা, গায়ে পাঞ্জাবী ও চাদর, পায়ে পাম্‌সু। ধীরে ধীরে ঘাটের বড় চাতালের উপর পায়চারী করিতেছেন। তাহার মুখের উপর আমার দৃষ্টি পড়িতেই মনে হইল—হয় তিনি কবি; না হয় তিনি সাধু। এই মনে করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার অলক্ষ্যে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। স্বভাবতই আমি লাজুক ও একটু ভীরু। তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার সাহস হইল না। কিছুক্ষণ পরে, তিনি ভ্রমণ শেষ করিয়া ঘাট হইতে চলিয়া গেলেন। আমিও বিষণ্ণ মনে বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

পরের দিন, পুর্ব্ব দিনের মত ঠিক সেই সময়ে, দূরে দাঁড়াইয়া ভদ্রলোককে আপাদমস্তক বিশেষ ভাবে দেখিয়া, আমার মনে ধারণা হইল—ইনি নিশ্চয়ই সাধু। কিন্তু তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন না, এবং আমিও গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব এমন সাহসও হয় না। সুতরাং কি করিয়া তাঁহার পরিচয় পাইব বুঝিতে পারিলাম না। এই প্রকারে প্রায় ১০।১২ দিন কাটিয়া গেল। আমি প্রত্যহই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘাটে যাই এবং এই ভদ্র-

লোকের কাছে কাছে পায়চারী করিতে থাকি। কিন্তু সাহস করিয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করিতে পারি না।

একদিন ভদ্রলোকটীকে চিনিবার সুযোগ মিলিয়া গেল। সেইদিন কয়েকজন আমেরিকান সাহেব মেম (গেরুয়া রং এর জামা কাপড় পরা রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য) উক্ত ভদ্রলোকটীর সহিত প্রায় আধঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন।

আমি দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয়ই এই ভদ্রলোকটী সাধু, তা না হইলে উহারা এতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলেন কেন ?

সেইদিন সাহেব মেম চলিয়া যাওয়ার পরে—মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া উক্ত ভদ্রলোকটীর সামনে দাঁড়াইয়া, হাত জোড় করিয়া বলিলাম—দেখুন আপনার কাছে আমার ছু' একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।

ভদ্রলোকটী শান্তভাবে বলিলেন—আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা বলুন।

আমার শবশিবা মন্দিরে মন্ত্রসিদ্ধির সময় যে দর্শন হইয়াছিল এবং মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, সে বিষয় তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলাম।

তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি যোগ অভ্যাস করেন ?

আমি উত্তর করিলাম—না' ত।

তিনি বলিলেন—তবে আপনি কি করেন ?

আমি বলিলাম—একটু নামজপ করি মাত্র।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—দীক্ষা হইয়াছে? গুরু গৃহী না সন্ন্যাসী?

আমি উত্তরে বলিলাম—আমি শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের আশ্রিত।

আমার উত্তর শুনিয়াই তিনি বলিলেন—তুমি আমাকে দাদা বলিও। আমি তোমাকে ভাই বলিব। তোমার ঠাকুর ত মহা-পুরুষ। আমিও তাঁহাকে জানি, তিনি আমাকেও স্নেহ করেন। তিনি যখন কলিকাতার বকুল বাগানে এক বাড়ীতে থাকিতেন তখন আমিও সেখানে যাইতাম এবং তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপদেশ পাইয়াছি। এখন হইতে তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার দাদা। তোমার নাম কি?

আমি আমার নাম বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—আমি তোমাকে গোপাল ভাই বলিয়া ডাকিব। তুমি আমাকে নরেনদা বলিয়া ডাকিও। এবং তিনি তাঁহার নাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন।

এই সময়টুকু কথাবার্ত্তা বলার ফলে আমার মনের ভয় ও সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। আমি সরলভাবে বলিলাম—দাদা! আমি শবশিবার মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসিয়া, যাহা দেখিয়াছি—তাহা কি সত্য এবং সম্ভব?

দাদা জোরের সহিত বলিলেন—তাহা খুবই সত্য এবং খুবই সম্ভব; অবিশ্বাস করিতেছ কেন? তবে ভাই এ সব কথা গুরু ভিন্ন অন্য কাহাকেও বলিতে নাই। আচ্ছা, আমাকে বলিয়াছ

তাহাতে কোন দোষ নাই, আর কাহাকেও বলিও না। তোমার যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে—আমাকে জিজ্ঞাসা করিও—আমি বলিব।

দাদার এই সরল সহানুভূতির এবং স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রতি আমার একটা বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব জাগিল। এবং আমার মন তাঁহাকে আপন ভাবিতে লাগিল। দাদার উপরোক্ত কথায় উৎসাহিত হইয়া আমি কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলাম—দাদা! আমার গীতা পড়িবার খুবই ইচ্ছা। কিন্তু আমি নিজে পড়িতে পারি না আর পড়িয়াও কিছু বুঝিতে পারি না। অনেকের নিকট গিয়াছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ, কেহই আমাকে গীতা পড়াইতে রাজী হইলেন না। আপনি যদি আমাকে গীতা পড়ান—তাহা হইলে খুবই ভাল হয়।

দাদা আমার কাতরতা এবং ব্যগ্রতা দেখিয়া বলিলেন—বেশ, সে ত ভাল কথা। আমি তোমাকে গীতা পড়াইব।

আমি দাদার কথায় যেন হাতে আকাশ পাইলাম। দাদাকে একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন সাধু বলিয়াই মনে হইল। আমি দাদার বাসার ঠিকানা ইত্যাদি ঠিকভাবে জানিয়া লইলাম। এবং দাদা বলিলেন—কাল সকালে গঙ্গায় স্নান করিয়া একখানা পরিষ্কার কাপড় পরিয়া, একটু শ্বেত চন্দন লইয়া, বেলা ৮টায় আমার নিকট যাইও।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—গীতা বই সঙ্গে লইয়া যাইব কি?

দাদা বলিলেন—বই নিয়া যাইতে হইবে না।

আমি মনে করিলাম, দাদা সাধু, তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই গীতা পুস্তক আছে। সেইজন্যই আমাকে এই কথা বলিলেন। এই কারণেই, আমার গীতা লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।

দাদা বাড়ী যাইতে উদ্যত হইলেন—আমি দাদার চরণে প্রণতঃ হইলাম। দাদা আমাকে অভয় দিয়া বলিলেন—কোন ভয় নাই। কাল সকাল ৮টায় আমার ওখানে যাইও, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে গীতা পড়াইব!

দাদা বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন, আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে সন্দেহ জাগিল—কি জানি যদি আমি কাল সকাল ৮টার মধ্যে দাদার বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারি। এই ভাবিয়া দাদার কিছু দূর যাওয়ার পর, আমি তাঁহার পেছনে পেছনে চলিতে লাগিলাম। আমার ইচ্ছা যে দাদার পেছনে যাইয়া বাড়ীটি দেখিয়া ঠিক করিয়া আসিব।

দাদা যাইতে লাগিলেন—আমি কিছু দূরে থাকিয়া অনুগমন করিতে লাগিলাম।

দাদা তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া জামাটী ছাড়িয়া পিছন ফিরিতেই দেখিলেন যে—আমি তাঁহার সামনেই দাঁড়াইয়া আছি।

দাদা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কি ভাই? এক্ষুণি এলে কেন? আমি ত কাল সকালে আসিতে বলিয়াছি।

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—পাছে আপনার বাড়ী এবং আপনি কোন ঘরে থাকেন তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হয়, এইজন্য তাহা দেখিয়া গেলাম।

দাদা একটু হাসিয়া বলিলেন—আমার কথার একটুও নড়চড় হইবে না? তুমি আসিও, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে গীতা পড়াইব।

দাদাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী আসিলাম। দাদার দর্শন পাওয়ার কথা এবং আমাকে যে তিনি গীতা পড়াইবেন, সংক্ষেপে সকল কথা মাকে বলিলাম।

মা আমার কথা শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন—বেশ, আমি তোর দাদার জন্য চন্দন ঘসিয়া রাখিব।

রাত্রে আহারের পর শুইলাম—ঘুম আসিতেছে না। মন অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছে, কেবল ভাবিতেছি কতক্ষণে ভোর হইবে এবং দাদার নিকট যাইয়া গীতা পড়িব। এই চিন্তাতেই রাত কাটিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া দাদার কথামত গঙ্গায় স্নান করিলাম। পরিষ্কার ধোয়ান কাপড় পরিয়া, চন্দনবাটী হাতে লইয়া দাদার ঘরে উপস্থিত হইলাম। দাদাকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন—আমাকে একটু চন্দন পরাইয়া দাও।

দাদাকে চন্দন পরাইতেছি এবং দাদাও সেই চন্দনের বাটী হইতে চন্দন লইয়া আমার কপালে, মুখে, বুকে, বাহুতে, চন্দন লেপিয়া দিয়া বলিলেন—গুরুজনের প্রসাদ নিজেরও নিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

আমি তখন ব্যগ্রভাবে বলিলাম—তাহা হইলে এবারে গীতা বইখানা দিন, খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করি।

দাদা একটু হাসিয়া বলিলেন—ভাই, আমার নিকট ত গীতা পুস্তক নাই।

দাদার এই কথায় হতাশ হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম—দাদার নিজের নিকটও গীতা পুস্তক নাই। আমাকেও আনিতে নিষেধ করিলেন, তবে বিনা পুস্তকে কি করিয়া গীতা পড়াইবেন? তাহা হইলে তিনিও কি শেষে আমাকে আশা দিয়া নিরাশ করিলেন!

দাদার সামনে দাঁড়াইয়া সংশয়াকুলচিত্তে এই সব কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাঁহার ঘরে একটী চৌকীতে বিছানা পাতা রহিয়াছে। সেই চৌকীর এক প্রান্তে বিছানার উপর তিনি বসিয়া আছেন এবং সামনে একটি টুল রাখা আছে।

তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—মুখের ভাব শান্ত ও গম্ভীর।

তিনি ইঙ্গিতে আমাকে সেই টুলের উপর বসিতে বলিলেন। মুখে কিছুই বলিলেন না।

আমি দাদার ইঙ্গিত অনুসারে সেই টুলের উপরে পা তুলিয়া আসন করিয়া বসিলাম।

বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্ত শরীর যেন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। চোখ দুইটী আপনি বুজিয়া আসিল। এমন কি শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াও যেন ধীর ও মন্থর হইতে লাগিল। মোটের উপর আমি শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমার সাধনসিদ্ধ অখণ্ড জপ ধ্যান ভিতরে চলিতে লাগিল।

কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না। হঠাৎ বড় ঘড়ি বাজিবার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ খুলিয়া দেখিলাম, দাদা প্রশান্তদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে চোখ খুলিতে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—কি ভাই, ঘুম ভাঙ্গল ? তুমি ত অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছ ?

দাদার এই কথায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া আমি অস্পষ্টভাবে বলিলাম—হাঁ দাদা ! শরীরটা যেন কেমন হইয়া গেল, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আর নাম যেন ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

দাদা হাসিয়া বলিলেন—নাম ভিতরেই থাকে, বাহির হয় না। তা ভাই, এখন গীতার শ্লোক বল।

আমি দুঃখিতভাবে বলিলাম—আপনি ত জানেন আমি গীতা জানি না।

তখন দাদা বলিলেন—আমি গীতার শ্লোক বল্‌ছি, তুমি শোন এবং শুনিয়া আমাকে বল।

তখন তিনি নিম্নলিখিত গীতার কয়েকটী শ্লোক বলিতে লাগিলেন।

প্রথম শ্লোকটী এই—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা
দিব্যম্ দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

গীতা ১১।৮

ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন
জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুম্ চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।

গীতা ১১।৫৪

আমি দাদার শ্রীমুখ হইতে এই শ্লোক শুনিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অর্থ করিয়া দাদাকে বুঝাইয়া বলিলাম।

দাদা প্রীত হইয়া বলিলেন—কৈ ভাই? এই ত তুমি গীতার শ্লোকও বলিতে পার এবং তাহার অর্থও করিতে পার—তবে তুমি গীতা পড়িতে পার না কেন বল?

আমি একটু লজ্জা সঙ্কোচের সহিত বলিলাম—আপনার নিকট হইতে শুনিলাম তবেই ত বলিতে পারিলাম।

দাদা এই রকম ভাবে গীতার বিভিন্ন অধ্যায় হইতে আরও কয়েকটী শ্লোক পর পর বলিলেন, আর আমিও আবৃত্তি করিয়া তাহার ভাবার্থ বুঝাইয়া বলিলাম (গ্রন্থ বিস্তৃতির আশঙ্কায় ঐ সব শ্লোক দেওয়া হইল না।)

দাদা আমাকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন—কে বলে তুমি গীতা জান না। বেলা অনেক হইয়াছে। বেলের সরবৎ প্রস্তুত করি—খাইয়া বাড়ী যাও।

দাদা বেলের সরবৎ প্রস্তুত করিবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেলেন।

আমি সেই টুলের উপর বসিয়া দেওয়ালের বড় ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—তখন বেলা প্রায় ১১টা। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—তবে দাদা কী কোন যাদু জানেন?

দাদার যাতুবিদ্যার ফলেই কী আমার ঘুমাইয়া পড়া এবং গীতা বলিতে পারা ইত্যাদি হইতেছে? আমি বিশেষ বিস্মিত হইয়া এ সব ব্যাপারের মনে মনে আলোচনা করিতেছি—এমন সময় দাদা বেলের সরবৎ লইয়া আসিলেন। সরবৎ খাইলাম।

দাদা বলিলেন—এখন বাড়ী যাও। বিকালে ঘাটে যাইও, দেখা হবে এবং কাল আবার এই সময় আসিও।

দাদার চরণে প্রণত হইয়া রাস্তা চলিতে আরম্ভ করিলাম। দেহ মনে যেন এক অপূর্ব্ব শান্তি ও তৃপ্তি বোধ করিতেছিলাম। দাদার সান্নিধ্য ছাড়িয়া যাইতে মন চাহিতেছিল না। তিনি যেন আমার খুব আপনার জন এই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। দাদার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জাগিয়া উঠিল।

দাদার আদেশ অনুযায়ী পরের দিনও সকালে যাইয়া পূর্ব্বদিনের মত উপস্থিত হইলাম। দাদাকে চন্দন পরাইবার পর দাদার ইঙ্গিতে নির্দ্দিষ্ট টুলটিতে বসিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। দেওয়াল ঘড়ি বাজিবার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখ খুলিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট দাদার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দাদা একটু হাসিয়া বলিলেন—কি ভাই? আজ যে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছ?

আমি তখন পর্য্যন্ত ঠিক নিজেকে গুছাইয়া লইতে পারি নাই। দাদার এই কথা শোনা সত্ত্বেও ঘুমের ঘোর তখনও যেন কাটে নাই। পুনরায় চোখ বুজিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলিতেই দাদা পূর্ব্বদিনের মত গীতার শ্লোক বলিতে লাগিলেন।

আজ কিন্তু দাদা যে কোন শ্লোকের প্রথম দিকের ছু একটী শব্দ বলামাত্র বাকী অংশ দাদার বলার সঙ্গে সঙ্গে আমিও আবৃত্তি করিতে পারিলাম এবং বেশ ভালভাবেই দাদাকে বাংলা অর্থ বলিতে পারিলাম। এই দিনকার প্রথম শ্লোকটি এই—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুতুর্লভঃ।

গীতা ৭।১৯

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্

গীতা ৯।২৯

এইরূপে বিভিন্ন অধ্যায় হইতে আরও কয়েকটী শ্লোক বলেন। (গ্রন্থ বিস্তৃতির সম্ভাবনায় তাহা এখানে দেওয়া হইল না।)

দাদা আমার আবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুমি ত ভাই, গীতা জানই। কেবল ভুলবশতঃ মনে করিতেছ—তুমি গীতা জান না।

পূর্ব্বদিনের মত সেদিনও দাদার শ্রীহস্তের তৈয়ারী বেলের সরবৎ খাইলাম। দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কালও কি এই সময় আসিব এবং একখানা গীতা আনিয়া নিয়মিতভাবে পড়িতে আরম্ভ করিব?

দাদা বলিলেন—কাল আর এ সময় আসিতে হইবে না। তবে প্রত্যহ বিকালের দিকে ঘাটে যাইও, সেখানে বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের কথাবার্ত্তা হইবে। বেড়াইবার পর আমার সঙ্গে এখানে চলিয়া আসিও—উপদেশ পাইবে। আর গীতা নিয়মিত-ভাবে পড়িতে হইবে না। যখন যাহা প্রয়োজন হইবে আপনিই ভিতর হইতে প্রকাশ পাইবে। তবে যদি ইচ্ছা কর—যে সব শ্লোক সহজে আসিবে না তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিয়া লইতে পার।

দাদার উপরোক্ত কথাগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে এবং সাবধানতার সহিত শুনিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—এও ত এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য ব্যাপার। মনে হইল, দাদার অলৌকিক শক্তিতেই আমার ভিতর এই জ্ঞান আসিয়াছে এবং দাদা এক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সাধু। কিন্তু নিজেকে গোপন রাখিবার জন্যই তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতেছেন। দাদার এই শক্তি সম্বন্ধে রাত্রিতে শুইয়া চিন্তা করিতে করিতে সন্দেহ হইল—তবে কী দাদা সত্যই কোন যাদুবিদ্যা জানেন? সেই যাদুবিদ্যার প্রভাবে আমাকে দুই দিন কয়েক ঘণ্টা ঘুম পাড়াইয়া গীতা শিখাইয়া দিলেন। আবার মনে হইল, যদি যাদুকরেরা গীতা শিখাইতে পারে, তবে ত মানিতে হইবে—তাহারাও মহাপুরুষ। কিন্তু কই যাদুকরেরা গীতাও শিখাইতে পারে না এবং মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত বা পূজিত হয় না। মোটের উপর ঘটনাটী যে কী, তাহা কোন রকমে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। তবে দাদা যে

একজন শক্তিসম্পন্ন সাধু—তাহা মন মানিয়া লইল।
দাদার প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস দৃঢ় হইল ও কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিল।

৩

মাধব পাগলার জ্ঞান অভিমুখী ভাব প্রাপ্তি

এই ঘটনার পর হইতে প্রত্যহ বিকালবেলা দাদার সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক উপদেশ পাইতে লাগিলাম। দাদাও আমার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিয়া লইলেন। ভ্রমণ শেষ করিয়া দাদার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে যাই। আমার সারাদিনে মনে মনে যে সব প্রশ্ন জাগে তাহা দাদাকে বলি এবং দাদা একটি একটি করিয়া আমাকে তাহার উত্তর দিতে থাকেন।

দাদার উত্তর আমার মনোমত না হইলে আমি প্রবল যুক্তি তর্ক উত্থাপন করিয়া বাধা সৃষ্টি করি। দু তিন দিনের মধ্যে দাদা আমার এই দোষ ত্রুটী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন— আমার বিদ্যার অভিমান অথবা আমার দুর্ব্বুদ্ধি—দাদার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে দিতেছে না। অর্থাৎ দাদাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি ; কিন্তু তাঁহার কথাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

দাদা আমাকে এই দোষমুক্ত করিবার জন্য এক দিন উপদেশ দেওয়ার সময় শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বলিলেন—দেখ গোপাল

ভাই ! তুমি যে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান তাহা আমি জানি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তুমি যাহা কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছ— তাহা কিছু কিছু দোষযুক্ত ; একেবারে নির্দ্দোষ নহে। সুতরাং আমার নিকট উপদেশ পাইতে হইলে তোমাকে এই সব জ্ঞান ভুলিতে বা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ভাবিও তুমি আমার নিকট একটি ৫ বৎসরের অবোধ শিশু। যদি ইহা মানিয়া লইতে পার তবেই আমার নিকট উপদেশ নিতে আসিও। নচেৎ তোমার পেছনে পরিশ্রম করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারিব না। আজ বাড়ী যাও। এ বিষয়ে তোমার কি সিদ্ধান্ত হয়, কাল আমাকে জানাইও।

বাড়ী আসিয়া দাদার এই কথাগুলি চিন্তা করিতে লাগিলাম। দাদার এই কঠিন কথায় এবং আদেশে আমার মনের ভিতর এক তোল পাড় আরম্ভ হইল। আমার বিদ্যাভিমান বলিতেছে— আমি ত আমার বাল্যকাল হইতে স্কুলে এবং কলেজে মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্র বলিয়া প্রশংসা পাইয়া আসিয়াছি। আর দাদা এদিকে বলিতেছেন—তাঁহার নিকট উপদেশ পাইতে হইলে নিজেকে ৫ বৎসরের অবোধ শিশু মনে করিতে হইবে।

কিছুতেই যেন কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিতেছিলাম না। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় মনে ইষ্টের কথা জাগিয়া উঠিল। বিচার করিয়া দেখিলাম—দাদার কথা মানিয়া লইলে আমার ইষ্টের সম্বন্ধে অনেক কথা দাদার নিকট হইতে আমি জানিতে পারিব। ইহা আমার এক

পরম লাভ হইবে। তাহা ছাড়া, দাদা আমাকে ত খুব স্নেহ করেন এবং তিনি কৃপা করিয়া আমাকে গীতাও শিখাইয়া দিয়াছেন। আমার ইষ্টের কথা শুনিতে পাইবার লোভই প্রবল হইল। দাদার কথা মানিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরের দিন যথাসময়ে দাদার নিকট উপস্থিত হইয়া দাদাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—দাদা! আপনার কথাই আমি মানিয়া লইয়াছি। তবে আমারও একটি কথা আপনাকে রাখিতে হইবে।

দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তা বেশ, তুমি যখন আমার সব কথাই মানিবে তখন তোমার একটি কথা যদি সম্ভব হয় আমি নিশ্চয়ই মানিব।

আমি হাতজোড় করিয়া বলিলাম—দাদা, আপনি আমার অপরাধ লইবেন না। যুক্তিতর্কে যদি আপনি হারিয়া যান, তবে আমার কথা মানিবেন ত?

দাদা বলিলেন—হাঁ নিশ্চয়ই! তুমি যদি আমার যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিতে পার, তবে তোমার কথা আমি নিশ্চয়ই মানিয়া লইব। তবে ভাই! তুমি পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহা আমার নিজের যুক্তিতর্ক নহে; ইহা মহামুনি ব্যাসের যুক্তিতর্ক। আজ পর্য্যন্ত কেহ ইহা খণ্ডন করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমি জানি না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দাদার নিকট গীতা শিক্ষার পর হইতে গীতার অনেক শ্লোক স্বতঃই আমার মনে উদিত হইত এবং মনে মনে তাহা আলোচিত হইত।

গীতা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্ম্মপুস্তকের অনেক শ্লোক মনের মধ্যে উদিত হইত এবং আপনিই আলোচিত হইত ; কিন্তু এই সব শ্লোক কোন্ পুস্তকের তাহা মনে করিতে পারিতাম না।

এই ঘটনার পর হইতে, প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত আমি দাদার নিকট উপদেশ পাইতাম এবং সন্ধ্যা আনুমানিক ৮টা হইতে রাত্রি ১১।১২টা পর্য্যন্ত উপদেশ শুনিতাম। রাত্রে দাদার আহার শেষ হইলে, আমি প্রসাদ পাইয়া বাসায় চলিয়া আসিতাম।

আমার উপদেশ শুনিবার একটু বৈশিষ্ট্য এই, দাদা যাহা বলিতেন তাহা একবার শুনিলে মুখস্থ হইয়া যাইত। ঠিক ঠিক ভাবে পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতাম। এজন্য দাদাও আমার প্রতি বিশেষ প্রীত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। দাদার নিকট আমার ইষ্টের বিষয় শুনিতে শুনিতে দেহ মনে এক ভাবান্তর উপস্থিত হইত। অধৈর্য্য হইয়া শিষ্টাচার এবং ভদ্রতা ভুলিয়া অনেক সময় কাঁদিয়া ফেলিতাম। দাদা আমার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একদিন আমাকে একা পাইয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—গোপাল ভাই! তোমার মধ্যে কিন্তু একটী দোষ দেখা যাইতেছে। আমি দাদার এই কথায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—সে দোষটী কি আমাকে বলিয়া দিন। যাহাতে দোষটা সংশোধন করিয়া লইতে পারি।

দাদা বলিলেন, আমার নিকট উপদেশ শুনিতে সুনীলবাবু, শচীনবাবু, বিজয়বাবু, স্বরূপানন্দজী প্রভৃতি অনেকেই আসেন।

কৈ তাঁহারা ত কেউ আমার উপদেশ শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলেন না? তুমি শিষ্টাচার ভুলিয়া কাঁদিয়া ফেল কেন? এ ত তোমার একটা মহৎ দোষ দেখিতেছি।

আমি দাদার কথায় একটু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম—হাঁ দাদা! এই দুর্ব্বলতা আমার আছে। এ ত আমার নিশ্চয় অন্যায়, কিন্তু আমি কি করিব? আপনার উপদেশে যখনই আমার ইষ্টের কথা শুনি, তখনই আমি ধৈর্য্যহারা হইয়া যাই এবং কাঁদিয়া ফেলি।

আমার এই উত্তর শুনিয়া দাদার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া আমার দুই কাঁধের উপর হাত রাখিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সান্ত্বনা এবং সমবেদনার সুরে বলিলেন—গোপাল ভাই সাধারণতঃ লোকের দুঃখে ও দারিদ্র্যের তাড়নায় চোখে জল আসে। ভগবানকে পাইলাম না বলিয়া কজনের চোখে জল আসে?

আমি তোমার উপর মোটেই বিরক্ত হই নাই। বরং প্রীত হইয়াছি। তবে ভাই এত অল্পেই যদি অধৈর্য্য হইয়া পড়—তবে পরে কি হইবে। ভাব গোপন করিলেই ভাব বৃদ্ধি পায়।

দাদার এই উপদেশ শুনিয়াই দাদার সম্বন্ধে যেন আমার এক নূতন ধারণা হইল। বুঝিলাম—তিনি শুধু বৈদান্তিক নহেন বৈষ্ণবও বটেন।

এর পর একদিন দাদা ব্রহ্ম বা আত্মা সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ করিতেছিলেন। সেই সময় উপনিষদের একটি শ্লোকের প্রথম লাইন বলিবার পর দ্বিতীয় লাইনটী তাঁহার মনে ঠিক আসিতেছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনটী অনায়াসে আমার মুখ হইতে বাহির হইল।

দাদা আমাকে এই লাইনটী বলিতে শুনিয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি গোপাল ভাই? তুমি কী উপনিষদ্‌ও পড়িয়াছ না কী?

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—না দাদা! আমি উপনিষদের নাম শুনিয়াছি মাত্র, এখন পর্য্যন্ত হাতে নিয়া দেখি নাই।

দাদা বলিলেন—তবে না জানিয়া বাকী অংশটা কি করিয়া বলিলে?

আমি উত্তরে বলিলাম—আপনি যখন এই শ্লোকটী বলিতে আরম্ভ করিলেন তখই আমার মনে হইল আমি যেন এই শ্লোকটী পূর্ব্বে কোথাও শুনিয়াছি অথবা আমি জানি।

দাদা হাসিয়া বলিলেন—শ্লোকটীর অর্থ বলিতে পার?

আমি "হাঁ"—বলিয়া দাদার উপদেশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়া বলিলাম। এই ঘটনার পর হইতে দাদা আমাকে একজন বিশেষ শ্রোতা বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্লোকটী নীচে দেওয়া হইল :—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাম্ বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্।

(অনুবাদ)

যে মনে করে ব্রহ্মকে জানি না বস্তুতঃ সেই তাঁহাকে জানে ; আর যে মনে করে ব্রহ্মকে জানি বস্তুতঃ সে তাঁহাকে জানে না। [কারণ] বিজ্ঞজনেরা তাঁহাকে অবিজ্ঞাত বলিয়া জানেন, আর অজ্ঞজনেরাই তাঁহাকে বিজ্ঞাত বলিয়া মনে করে।

দাদা আর একদিন উপদেশক্রমে বলিলেন—**গুরুকে ধ্যান করাই শাস্ত্রের বিধি।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন ?

দাদা বলিলেন—গুরু জ্ঞানময়। **তুমি যদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে অখণ্ড ধ্যানে ধরিতে পার তাহা হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্ঞান তোমাতে আসিবে এবং তোমার অজ্ঞানতা ঠাকুরে যাইয়া লয় বা লীন হইবে।**

দাদার এই কথায় আমার সাধন জগতের একটা নূতন জ্ঞান লাভ হইল। এখানে বলা বাহুল্য, দাদার এই কথা শুনিবার পূর্ব্ব হইতেই আমার সাধনসিদ্ধ অভ্যাসবশতঃ আমি অখণ্ড জপ ধ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরিতে অভ্যস্ত ছিলাম। দাদার কথিত এই জ্ঞানটী কিন্তু আমার ছিল না।

———

৪

দিব্যদৃষ্টি লাভ

এই জ্ঞান লাভের পর হইতে দাদার মূর্ত্তিও ধ্যানেতে ধরিতে লাগিলাম। আমার উদ্দেশ্য এই যে, দাদা ত অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। সুতরাং দাদাকে ধ্যান করিলেই দাদার জ্ঞানও আমাতে আসিবে। কিন্তু এ বিষয় দাদা কিছুই জানিতে পারিলেন না বা দাদার নিকট আমি কিছুই প্রকাশ করিলাম না।

ইহার কয়েক মাস পরে একটি ঘটনায় দাদা ইহা ধরিয়া ফেলিলেন। ঘটনাটী এই—

তখন চৈত্রমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, গরম পড়িয়াছে। হঠাৎ একদিন বেলা আন্দাজ ২॥ টার সময় প্রবলবেগে ঝড় ও জল আরম্ভ হইল।

আমি তখন আমার ঘরে ঘুমাইতেছিলাম, ঝড় জলের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

(এই সময় সর্ব্বদাই দাদার মূর্ত্তিটীকে ধ্যানে ধরিয়া রাখিতাম।)

ঝড় জলের বেগ অনেকটা কমিয়া আসিতেছে এবং একটু শীত শীত অনুভূত হইতেছে। দেখিলাম—দাদা তাঁহার ঘরে চৌকীতে বিছানার উপর খালি গায়ে বসিয়া আছেন। ছু দিকের ছুটী দরজা জানালা দিয়া জলের ঝাঁপটা দাদার গায়ে লাগিতেছে এবং দাদার একটু শীতও করিতেছে। অথচ তাঁহার এই বিষয়ে কোন খেয়াল নাই ; তিনি স্থির হইয়া বসিয়া আছেন।

আমি আমার পাতালেশ্বরের বাসার ঘরে বসিয়া, বাঁশফটকায় দাদার ঘরে এই দৃশ্য দেখিয়া, বিশেষ ব্যস্ত হইয়া মাকে বলিলাম —মা ! আমার ধোয়ান গরম কাপড়খানা শীগ্‌গীর্ বাক্স হইতে বাহির করিয়া দাও।

মা বলিলেন—এই গরমের সময় তুপুরবেলা ; গরম কাপড় দিয়া কি হইবে ?

আমি বলিলাম—দাদার শীত করিতেছে। দাদার ত গরম কাপড় নাই, দাদাকে যাইয়া দিয়া আসি।

মা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—দাদার শীত করিলে, দাদা নিজেই ত কাপড় গায়ে দিতে পারিবেন। তাঁহার যে শীত করিতেছে, তুই কী করে দেখ্‌লি ?

আমি বলিলাম—দেখিয়াছি বলিয়াই ত তোমাকে বলিলাম। শীগ্‌গীর, গরম কাপড়খানা দাও।

মা আমার এই প্রকার পাগলামি প্রায়ই দেখিতেন। সুতরাং তাড়াতাড়ি কাপড়খানা আনিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি কাপড়খানা কাগজে জড়াইয়া, দ্রুতবেগে বাঁশফটকায় দাদার বাসার দিকে রওনা হইলাম। তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে। একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে।

দাদার ঘরে গিয়া দেখিলাম—দাদা ঠিক আমার দৃষ্টপূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থায় বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া দাদা বলিলেন—এ কি ভাই ? এই তুপুরবেলায় কেন এলে ? তোমার হাতে ওটা কি ?

আমি তখন গরম কাপড়খানা কাগজ হইতে খুলিয়া দাদার হাতে দিয়া বলিলাম—আমি ঘরে বসিয়া দেখিলাম, আপনার শীত করিতেছে। তাই এই কাপড়খানা লইয়া আসিলাম।

দাদা যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোমার এই ব্যবহারে লোকে তোমাকে পাগল মনে করিবে।

আমি বলিলাম—না দাদা, আমার দেখাটা সত্য কি না—তাহা পরীক্ষা করার জন্য আমি আসিয়াছি।

দাদা একটু রাগতভাবে বলিলেন—এই বুঝি গুরুমারা বিদ্যা আরম্ভ করিয়াছ?

দাদার ভাব দেখিয়া আমি অবাক হইয়া বলিলাম—এটা গুরুমারা বিদ্যা কিসে হ'ল দাদা? আমি দেখিলাম তাই আসিয়াছি।

দাদা বলিলেন—না! এসব করা আর চলিবে না। ইহা অন্যায়।

আমি বলিলাম, অন্যায় কেন?

দাদা বলিলেন—বাতাসা খাইয়াই যদি পেট ভরাইয়া ফেল, তবে রসগোল্লা সন্দেশ খাইবার পেটে জায়গা কোথায়? এই সব অভ্যাস করিলে সাধনপথের অগ্রগতি বন্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে। এই জন্য ইহা অন্যায়।

আমার অনুরোধে দাদা গরম কাপড়খানা একটু গায়ে দিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—কি ভাই! দুঃখিত হও নাই ত?

আমি বলিলাম—না দাদা, আপনার প্রত্যেকটী কথা আমার পক্ষে অমূল্য উপদেশ। মনে হয়, জীবনে এই রকম উপদেশ আর পাইব না।

আমি দাদার চরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

দাদা মধ্যে মধ্যে কাশী ছাড়িয়া তীর্থভ্রমণে যাইতেন। তখন আমার উপদেশ নেওয়া বন্ধ থাকিত। পরে ফিরিয়া আসিলে আমি উপদেশ পাইতাম। প্রায় ১৮ মাসকাল আমি দাদার নিকট উপদেশ পাই। আমার উপদেশ নেওয়া চলিতেছে এই সময় দাদা একবার বৃন্দাবনে যান।

তখন ডিসেম্বর মাস, অত্যন্ত শীত। দাদা যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি। কতদিন থাকিব এবং কবে আসিব তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি শ্রীশ্রীরাধারাণী দয়া করেন তবেই ত সেখানে থাকিতে পারিব।"

আমার উপদেশ পাওয়া বন্ধ থাকিবে এইজন্য আমি তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়ায় মনে মনে দুঃখিত হইলেও, তাঁহার এই প্রকার কথা শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলাম—দাদা! আপনি যদি শ্রীশ্রীরাধারাণীর দয়া না পান তবে আমাদের ত আর আশাই নাই।

দাদা বলিলেন—কি জানি ভাই! তিনি যে কাহাকে দয়া করিবেন একমাত্র তিনিই জানেন, আমাদের জানিবার উপায় নাই।

দাদা বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। কোন ঠিকানাই দিলেন না। দাদা এখানে না থাকায় আমি নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম। এবং সর্ব্বক্ষণ দাদার কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

দাদা এখান হইতে যাওয়ার তিন চার দিনের মধ্যে একদিন সকালের দিকে দেখিতেছি যে—বৃন্দাবনে দাদা একটি খাটিয়ায় মোটা চাদরের উপর একটি কম্বল গায়ে দিয়া শুইয়া আছেন। প্রবল জ্বর—গলা, গাল ইত্যাদি ফুলিয়া গিয়াছে এবং অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

এই দৃশ্যটী চোখে পড়িতেই, চোখে জল আসিল। এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কারণ, দাদা আমাকে ঠিকানা না দেওয়ায়, কোন পত্র বা তার পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না।

অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এখানে অন্য কাহাকে তিনি ঠিকানা বলিয়া যান নাই। দাদার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আমিও মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। আমার এই দর্শনটী সত্য কি না জানিবার জন্য সেদিনকার তারিখটী (২৮ ডিসেম্বর) আমার ঘরের ক্যালেণ্ডারে বিশেষ চিহ্নিত করিয়া মনে করিয়া রাখিলাম।

মার্চ্চমাসে দাদা বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। স্বরূপানন্দজীর সহিত রাস্তায় দেখা হইলে তিনি বলিলেন—দাদা আসিয়াছেন। দাদা যে বাড়ীতে থাকিতেন উপরোক্ত স্বরূপা-

নন্দজী সেই বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং দাদার ভক্ত ও সেবক ছিলেন।

আমি দাদাকে প্রণাম করিয়া, দাদার সামনে দাঁড়াইয়া বলিলাম—আপনি গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কোথায়, কেমন ছিলেন ?

দাদা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—গোপাল ভাই ! আমি না তোমাকে এসব করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম—আমি কিছু করি নাই। তবে যাহা দেখিয়াছি, তাহা সত্য কি'না জানিবার জন্য আমি এই তারিখটী নোট করিয়া রাখিয়াছি।

তিনি বলিলেন—আমি বৃন্দাবনে যাইয়া, যমুনার জলে স্নান করিবার ফলে অত্যধিক ঠাণ্ডায় আমার গাল, গলা ফুলিয়া যায় এবং প্রবল জ্বরে কষ্ট পাই। তুমি যাহা দেখিয়াছ—তাহা ঠিক। কিন্তু ইহা করা বড় অন্যায়। এইজন্য আমি তোমাকে নিষেধ করিয়া দিলাম। সেদিন কিন্তু আমিও দাদার কথায় জোরের সহিত বলিলাম—আমি নিজে ত কিছু করি নাই। আপনি চলিয়া যাওয়ায় কেবল আপনার কথাই আমার দিনরাত মনে হইত। সেইজন্যই আমি এ দৃশ্যটী দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতে আমার দোষ কী ?

আমি এতক্ষণ দাদার সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলাম। দাদা আমার আজিকার ভাব বুঝিয়া বলিলেন—ভাই, একটু স্থির হইয়া বোসো। আমি তোমাকে ব্যাপারটী বুঝাইয়া দিতেছি।

"তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহার দাম তিন পয়সা মাত্র। কারণ একখানা পোষ্টকার্ড খরচ করিলেই ত এ ব্যাপার জানিতে পারিতে। এই সামান্য জিনিষকে এত মূল্য দিতেছ কেন? আমাদের দেশের অনেক সাধু এই সামান্য পুঁজি সম্বল করিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে। অর্থাৎ কিছু টাকা পয়সা রোজগার করিতে থাকে। ফলে অল্প দিনে পুঁজি ফুরাইয়া যায়, দেউলিয়া হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকিও। হাতে চাকু (ছুরি) পাইয়া পাড়া-পড়শীর লাউ কুমড়ার গাছ কাটিতে আরম্ভ করিও না। তাহা হইলে কিন্তু ভগবান তোমার হাত হইতে চাকু (ছুরি) কাড়িয়া লইবেন। আর জীবনে কখনও তোমার হাতে চাকু দিবেন না।"

দাদার কথার প্রত্যুত্তরে বলিলাম—যদি বিনা চেষ্টায় স্বতঃই এই প্রকার দর্শন হয় তাহা হইলে কি আমার দোষ হইবে?

দাদা হাসিয়াই বলিলেন—যদি ভগবৎ ইচ্ছায় হয় তাহা হইলে তোমার কোন দোষ নাই।

আমি একটু দুঃখিত হইয়াছি ভাবিয়া, দাদা বলিলেন—আমার কথায় তুমি দুঃখ পাও নাই ত? আমি তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি।

উত্তরে আমি বলিলাম—না দাদা! আপনার এই অমূল্য উপদেশ আমার সাধনপথের প্রধান সম্বল। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই বলিয়া প্রণাম করিলাম এবং প্রণামান্তে পুনরায় বলিলাম—আপনার কথার অর্থ বেশ ভালোভাবেই

বুঝিতে পারিয়াছি। ভগবান আমাকে দিয়া যাহা করাইবেন তাহাই যেন হয়। আমি যেন নিজের চেষ্টায় তাহার কার্য্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করি।

দাদা আমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—গোপাল ভাই! তুমি সত্যই বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছ, ইহাই আমার তোমাকে বলিবার উদ্দেশ্য।

৫

মাধব পাগলার ইষ্টনিষ্ঠা

ইহার কিছুদিন পরে রাত্রিতে একদিন দাদার উপদেশের পর সকলে চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় দাদা আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া বলিলেন—ভাই! আজ তোমাকে একটি বিশেষ গুরুতর বিষয় বলিব। তুমি কিন্তু ভাই তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইও না এবং আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে না।

দাদার কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হইল, কি জানি হয় ত দাদা আজ আমার কোন দোষের কথাই বলিবেন।

দাদার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি যেন আজ একটু বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াই বলিতেছেন।

দাদা বলিলেন—দেখ গোপাল ভাই! তুমি ত ব্রাহ্মণ? সুতরাং তোমার ইষ্ট বা উপাস্য নারায়ণ হওয়া উচিত।

দাদার কথায় একটু চমকিত হইয়া এবং ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিলাম—হাঁ দাদা, আপনার কথা ত ঠিক। পণ্ডিত মহাশয়েরা বলেন—শাস্ত্রানুসারে শ্রীশ্রীনারায়ণ বা বিষ্ণুই ব্রাহ্মণের উপাস্য।

দাদা গম্ভীরভাবে বলিলেন—তাহা হইলে এখন তুমি কি করিবে ভাবিয়া দেখ। নন্দনন্দন কৃষ্ণ, গয়লার ছেলে এবং নারায়ণ এই দুজনের মধ্যে কাহাকে তোমার ভাল লাগে ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—হাঁ দাদা ! শাস্ত্রানুসারে শ্রীশ্রীনারায়ণই আমার উপাস্য হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা ত হইতেছে না। নন্দনন্দন কৃষ্ণ, গয়লার ছেলে—তাহাকেই ত আমার ডাকিতে ইচ্ছা করে এবং ভাল লাগে।

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর মাধব পাগলার ইষ্ট বা উপাস্য কে সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দেন নাই। নন্দনন্দন কৃষ্ণকে মাধব পাগলার মনে ভাল লাগে বলিয়াই, তিনি তাহাকে ইষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।)

আমার উত্তর শুনিয়া দাদা বলিলেন—তবে ভাই তুমি আজ রাত্রে বাড়ী যাইয়া, এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখ, যাহাকে তোমার ভাল লাগিবে, কাল আসিয়া আমাকে বলিও।

আমি রাত্রিতে মনে মনে শাস্ত্রযুক্তি এবং পণ্ডিতগণের উপদেশ সবই বিচার করিয়া দেখিলাম—নারায়ণই আমার উপাস্য হওয়া উচিত। কিন্তু মন ত আমার কিছুতেই সায় দিতেছে না।

কারণ নারায়ণকে মন ভালও বাসে না—ডাকিতেও চায় না। অগত্যা নিরূপায় হইয়া মনকে বুঝাইতে না পারিয়া স্থির করিলাম—নন্দনন্দন কৃষ্ণকেই ডাকিব এবং ভালবাসিব। তাহার সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে বলিলেই ত সে আমাকে নারায়ণ পাওয়াইয়া দিতে পারিবে। কারণ দাদা একদিন উপদেশকালে

বলিয়াছেন যে—নন্দনন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান; অর্থাৎ তিনি সবই করিতে পারেন। মনে মনে এই বুদ্ধি স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে ঘুম হইতে উঠার পরও আমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্র অনুসার না হওয়ায় মন একটু সঙ্কুচিত এবং বিষণ্ণ হইয়া রহিল। দাদার নিকট উপস্থিত হইতেই দাদা বলিলেন—কি গোপাল ভাই! কি স্থির হইল? কি সিদ্ধান্ত করিলে?

আমার মনে কিন্তু একটু অপরাধীর ভাব লাগিয়াই আছে। আমি বলিলাম—দাদা, শাস্ত্র অনুসারে আমার উপাস্য নারায়ণই হওয়া উচিত। কিন্তু আমার মন তাহাকে চায় না। সুতরাং আমি নন্দনন্দন কৃষ্ণকে ডাকিব এবং ভালবাসিব।

দাদা আমার মুখে এই উত্তর শুনিয়া যেন একটু হতাশ হইয়া বলিলেন—তবে আর ভাই কি করবে? তোমার যেমন কপাল তেমনই হবে।

দাদার এই উত্তর শুনিয়া আমার মনে হইল, দাদা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। এবং দাদা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হন সেজন্য উৎসাহ দিবার ভঙ্গীতে বলিলাম—দাদা! আমি কিন্তু এ ব্যাপারে একটী বিশেষ বুদ্ধি খাটাইয়াছি।

দাদা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সে বুদ্ধিটী কি ভাই?

আমি বলিলাম—আগে ত কোন প্রকারে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাই, তাহার পর, তাহাকে বলিলে সে অনায়াসেই নারায়ণকে পাওয়াইয়া দেবে।

কারণ, আপনি সেদিন বলিয়াছেন—নন্দনন্দন কৃষ্ণ সর্ব্ব শক্তিমান এবং তিনি সবই করিতে পারেন।

দাদা আমার এই উত্তরে হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—হাঁ ভাই! এ ব্যাপারে তুমি সত্য সত্যই মুখুজ্জ্যে ব্রাহ্মণের বুদ্ধি খাটাইয়াছ।

এই সময় বিজয়বাবু এবং স্বরূপানন্দজী আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। এবং দাদা উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

৬
বাৎসল্যরসের ইঙ্গিত

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, একদিন সকালবেলা দাদার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—ঘড়িতে আটটা বাজিতে তখনও বাকী আছে। দাদা শান্তভাবে তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানটীতে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। চোখ যেন ছল ছল করিতেছে, মুখে একটা দিব্য প্রশান্ত—কেমন কেমন ভাব। দাদার মুখে চোখে এ রকম ভাব পূর্ব্বে আর কোন দিন আমি দেখি নাই। আমি দাদার নিকটে যাইয়া, একটু বিস্মিত হইয়া দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—দাদা! আপনি আজ এত কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন?

দাদা আমার কথা শোনা মাত্র, নিজের ভাব গোপন করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—আমি ত ভাই সেই গয়লার ছেলেটীর কথা ভাবিতেছিলাম।

আমি দাদার মুখে "গয়লার ছেলেটী" শব্দ শুনিয়া একটু চমকাইয়া উঠিলাম। দাদার মুখে যেন হাসি আর ধরে না। তিনি বলিতে লাগিলেন—মনে কর ভাই! তোমার আদরের সেই শ্যামসুন্দরটি যদি এখন হঠাৎ আমার সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমি ত ভাই ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিব এবং হয় ত পলাইয়া যাইব। কিন্তু তোমার ত ভাই সে বালাই নাই। কারণ, তাহার সহিত তোমার চেনা পরিচয়ও আছে, আর তুমি তাকে ভালও বাস—হয় ত আদর করিয়া কোলে তুলিয়াই লইবে। আমি ত আর তা পারিব না।

দাদার মুখ হইতে "আদরের শ্যামসুন্দর" এই কথাটী শোনামাত্র আমার অন্তরের দুর্ব্বলতম স্থানটীতে আঘাত পড়ায় ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; পুলক শিহরণে দেহ কম্পিত হইল, চোখে জল আসিল।

একটু অসহিষ্ণুভাবে দাদার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—না দাদা! এ আপনার ভুল ধারণা, আপনারও ভয় ত হবেই না, বরং আপনিও আদর করিয়া আমার শ্যামকে কোলে তুলিয়া লইবেন। তাহাকে যে দেখিবে সেই ভালবাসিবে।

বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম; চিত্ত আমার ভারাক্রান্ত হইল। অবশ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট টুলটিতে বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে কান্নার বেগ থামিলে দাদার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দাদারও চোখ দুইটী লাল এবং

চোখ হইতে অশ্রু গড়াইতেছে। কিন্তু তিনি শান্ত এবং স্থির ভাবে আপন আসনে বসিয়া আছেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরে দাদা আমাকে সান্ত্বনা দিবার সুরে বলিলেন—ভাই! এত অল্পেতেই যদি অধৈর্য্য হইয়া পড়, তবে তোমার আদরের শ্যামের সহিত খেলা-ধূলা করিবে কি করিয়া? কাজেই ভাব গোপন করিয়া গম্ভীর হইবার চেষ্টা কর। তবেই ভাবের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে!

এখানে উল্লেখযোগ্য যে—দাদার নিকট দুই দিন ঘুমাইয়া গীতাশিক্ষার পর হইতে আমার দেহমনে যেন একটা কেমন কেমন ভাব বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইল। পরে শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারিলাম এই সব লক্ষণই ভাব সমাধির সুস্পষ্ট লক্ষণ।

একদিন সাধু সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দাদা বলিলেন—ভাই! আমাদের দেশে সাধু চেনা কঠিন। কারণ অনেক দিন পূর্ব্বে ছাপড়া জেলার কোন এক গ্রামে এক সাধু ছিলেন। লোকে তাঁহাকে সাধু মনে না করিয়া পাগলই মনে করিত। সেই সাধু পাগলের মতই ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং "আমার মাধব খুব ভাল" সর্ব্বাবস্থাতেই এই কথা বলিতেন বলিয়া লোকে তাহাকে "মাধব পাগলা" বলিয়া ডাকিত।

আমাদের দেশে অনেক পাগল দু একটি কথা ঠিক বলিতে পারায় তাহারা সাধু বলিয়া পূজিত হন।

আবার অনেক যথার্থ সাধুতে অলৌকিকত্বপ্রকাশ না পাওয়ায়

লোকের দ্বারা পাগল বলিয়া নিন্দিত ও নির্য্যাতীত হন। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশে সাধু চেনা খুবই কঠিন।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষোনৃণাং কল্পশতৈরপি॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

শ্রীযুক্ত নরেনদার নিকট আরেকদিন কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম—এ কিন্তু ভগবানের বড় অন্যায় দাদা! পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লোপ করাইয়া দিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন।

উত্তরে দাদা বলিলেন—"অন্যায় কিসের ভাই? ভগবানে কোন দোষ নাই। জীবের কল্যাণের নিমিত্তই ভগবান স্মৃতি লোপ করাইয়া দেন। আমার বুঝিবার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া দাদা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—

ধর, পূর্ব্বজন্মে আমি তোমার শত্রু ছিলাম। তোমার অনেক ক্ষতি সাধন করিয়াছি। এ জন্মে তোমার স্মৃতি জাগরুক থাকিলে তুমি কি আমার নিকট উপদেশাদি লইতে পারিতে—না, আমাকে দাদা বলিয়া ভালবাসিতে পারিতে?

আমি বলিলাম—না দাদা, এরূপ জানিলে আমি আপনার উপর প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইতাম।

দাদা বলিলেন—"তবেই বুঝিয়া দেখ, আমাদের দেওয়া নেওয়া কাজের নিষ্পত্তি ঘটিত না। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লোপ করিয়া দেওয়ায়ই তুমি আমাকে আপন বলিয়া ভাবিতে পারিতেছ

এবং আমাদের উভয়ের যতটুকু দেওয়া নেওয়া—সদ্ভাবে দিতে ও নিতে পারিতেছি।

এইবার ভাবিয়া দেখ—জন্মান্তর স্মৃতি লোপ করাইয়া দিয়া আমাদের দেনা পাওনার কাজ, ভগবান কিরূপ সুন্দরভাবে ও সুদক্ষতার সহিত করাইয়া লন।

এই আদান প্রদান হইতে ছুটী না মিলিলে কী জীবের মুক্তি সম্ভব হয় ?"

আমি প্রশ্ন করিলাম—তবে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লাভ করা কী সম্ভব নহে।

দাদা উত্তর করিলেন—অসম্ভব বলিতেছি না। তবে সাধন ভজনের পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে—সাধনের এক বিশেষ অবস্থায় যখন পূর্ব্বজন্ম স্মৃতিলাভেও সাধকের দেহ ও মনে কোনরূপ বিরোধ আসে না; এবং সাধক আপন নিষ্ঠায় অবিচলিত থাকিয়া যখন ভগবৎশক্তির দ্বারাই চালিত হয় তখনই শ্রীভগবান কৃপা করিয়া তাহার সাধন ভজনের পথ অধিকতর সুগম করিবার জন্যই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যতখানি জানান দরকার ঠিক ততখানি তাহাকে জানাইয়া দেন।

৭

ইষ্ট তাদাত্ম্যের ইঙ্গিত

দাদার সহিত উপরোক্ত কথাবার্ত্তার পর হইতেই ইষ্টকে কী নামে ডাকিলে মন তৃপ্ত হইবে চিত্তে এই অনুসন্ধান জাগিয়া

উঠিল। (এ বিষয়ে মাধব শব্দটী পাওয়ার বিবরণ মাধব পাগলা নাম কি করিয়া হইল অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) এই ভাব সমাধি অবস্থায় একদিন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম—কৈ এখনও ত আমার মাধবের দেখা পাইলাম না। সে হয় ত আমার একটি ডাকও শুনিতে পাইতেছে না। অথবা সে আমার ডাক যাহাতে শুনিতে না হয়—সেইজন্য দূরে সরিয়া বসিয়া আছে। অথবা সে যদি আমার ডাক শুনিয়াও না আসে, তবে আমি কি করিয়া তাহাকে পাইব?

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে হতাশ এবং নিরাশায় মন যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সারাদিন এই প্রকার নানা-রকম চিন্তায় কাটিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ৭টার পরে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই দাদার নিকট উপস্থিত হইয়া দাদাকে প্রণাম করিয়া, যেন একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলাম—আচ্ছা দাদা! শ্রীশ্রীঠাকুরও বলেন—তাঁহাকে ডাক তবেই হবে। আপনিও বলেন, তাঁহাকে ডাক, এবং অন্যান্য মহাপুরুষেরা বলেন—তাঁহাকে ডাক তবেই হবে। কিন্তু তিনি যে ডাক শুনিবেনই—তাহার কোন (গ্যারাণ্টি) নিশ্চয়তা আছে কি?

দাদাকে এই কথা বলিতে বলিতে নিরাশায় এবং মাধবকে না পাওয়ার ব্যথার আবেগে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আজ যেন দাদা পূর্ব্ব হইতেই আমার উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করিয়াই,

বিশেষ শান্ত ধীর, অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—গোপাল ভাই! তোমার প্রত্যেকটী ডাক তোমার মাধবকে চঞ্চল করিতেছে। এবং তোমারই চোখের জলে তোমার মাধব নিয়ত অভিষিক্ত হচ্ছে। এর পরও তুমি বলছ, মাধব তোমার ডাক শুনছে না। দাদা এই বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পূর্ব্ব সর্ত্ত অনুসারে এবং দাদার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দৃঢ় হওয়ায় আমি দাদার প্রত্যেকটী কথাই অকাট্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।

দাদার মুখে এই কথা শোনামাত্র স্তম্ভিত হইয়া, চুপ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—দাদার কথানুসারে তবে কি মাধব আমারই আশে পাশে অথবা আমার পিছনে লুকাইয়া থাকিয়া আমার ডাক শুনে? তাহা না হয় সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু আমার চোখের জল মাধবের গায়ে কি করিয়া পড়া সম্ভব?

ইহার কিছুক্ষণ পরে স্বরূপানন্দজী বেলফুলের মালা ও কিছু ফল হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিলেন, এবং দাদার গলায় মালাটি পরাইয়া দিলেন।

দাদা তৎক্ষণাৎ আপন গলা হইতে মালাটি খুলিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিলেন। তখন সুনীলবাবু বিজয়বাবু প্রভৃতি উপস্থিত সকলেই এই ব্যাপার দেখিয়া কৌতূহল বোধ করিলেন।

কিন্তু দাদাকে সাহস করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। এবং এ ব্যাপারের কিছু বুঝিতেও পারিলেন না।

সেদিন দাদার উপদেশ প্রায় রাত্রি ১০টায় শেষ হইল। অন্যান্য সকলে বিদায় হইলেন। দাদা তাঁহার নিজের আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা গোপাল ভাই! তুমি আমার শরীরটাকে বেশ করিয়া চাপিয়া ধর, দেখি তোমার গায়ে কত জোর আছে।

আমি হাসিতে হাসিতে দাদার আদেশমত দাদার শরীরটাকে বিশেষ জোরের সহিত চাপিয়া ধরিলে, দাদা আমাকে বলিলেন—তা তোমার গায়ে ত তেমন জোর নাই, আচ্ছা আমি তোমাকে চাপিয়া ধরি, দেখ আমার গায়ে কত জোর আছে। দাদা আমার পেছন দিক হইতে আমাকে তাঁহার বুকে চাপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আজ কিন্তু দাদার এই কাণ্ডটা বুঝিতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। বুঝিলাম, দাদা আজ আমার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমাকে দেহমনের সমস্ত পাপ ও গ্লানি হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়াই এই কাণ্ডটি করিলেন।

দাদার আহার শেষ হইলে, প্রসাদ পাইয়া আমি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে আজ বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী ফিরিবার পথে কেবলই মনে হইতে লাগিল—সাধনপথে গুরুই প্রকৃত বন্ধু ও সুহৃদ এবং তিনি স্বীয় উদারতায় সাধকের সাধন পথ এই ভাবে নানা প্রকারে সুগম করিয়া দেন।

আশান্বিত হইয়া ভাবিলাম—দাদার কৃপায় নিশ্চয়ই 'আমার মাধব' লাভ হইবে।

কারণ বুঝিলাম—দাদা বৈদান্তিক ও পরম বৈষ্ণব।

৮

দেহাভিমান থাকা পর্য্যন্ত সাধু হওয়া যায় না

একদিন দাদার পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলাম—দাদা! আপনি ত অনেক লোককে সাধু করিয়া দিয়াছেন, আমাকেও সাধু করিয়া দিন।

দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ভাই! এখন যে লোকটি সাধু হতে চাইছে—তুমি সাধু হলে সে লোকটি কিন্তু আর থাকবে না।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—তবে আর সাধু হয়ে লাভ কি?

দাদা বলিলেন—লাভ লোকসানের হিসাব থাকা পর্য্যন্ত সাধু হওয়া যায় না।

ভক্তবৎসল ভগবান

আরেক দিন কথা প্রসঙ্গে দাদাকে বলিলাম—দাদা! যদি কোনদিন আমার মাধবের দেখা পাই, তবে তাঁকে অনুযোগ সহকারে বলিব—হায় মাধব! তুমি থাকিতে আমি এত দুঃখ ভোগ করিলাম।

দাদা একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—ভাই! মাধবের দেখা পাইলে তোমার মনে আর অনুযোগের ভাব থাকিবে না। আর যদি থাকেও, বলিতে পারিবে

না। আর যদি বলিতেও পার, তবে মাধবের নিকট হার মানিয়া লজ্জিত হইতে হইবে। কারণ মাধব যদি জিজ্ঞাসা করে, হাঁরে পাগলা! তোকে আমি জন্ম জন্ম এত ভালবেসে আস্‌ছি তুই আমাকে কি করে ভুল্‌লি? এমন কি আমার "নামটী" পর্য্যন্ত ভুলে গেলি? তখন তুমি কি জবাব দেবে?

দাদার এই কথা শুনিয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলাম কথাটা খুবই সত্য। কেননা পূর্ব্বজন্মের যে মাধব পাগলা "মাধব" "মাধব" বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিয়াছিল, সে এবারে আসিয়া এমন কী "মাধব" নামটী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। "মাধবই" কৃপা করিয়া সেই নামটী তাহাকে জানাইয়া দিলেন।

ইষ্ট-প্রীতিতেই ভক্তের চরম তৃপ্তি

ইহার কিছুদিন পরে একদিন দাদাকে বলিলাম—দাদা! আমার সন্ন্যাস নেওয়ার খুবই ইচ্ছা হইতেছে।

দাদা বলিলেন—তোমার মা বর্ত্তমান এবং তুমি তাহার একমাত্র পুত্র এইজন্য তোমার সন্ন্যাস নেওয়া উচিত নয়। এখন তোমার যে ভাবভঙ্গি তাহাতে সন্ন্যাসের কঠোর নিয়মাদি তোমার দ্বারা পালিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর সর্ব্বোপরি যুক্তি এই মনে কর, তুমি সন্ন্যাস লইয়া ব্রহ্মভূত হইয়া বসিয়া আছ। তখন তুমিও ব্রহ্ম এই বোধ জাগিলে যদি তোমার মাধব আসিয়া বলেন—পাগলা তোর

শরীরটা আমায় দে, কিছু কাজ করিয়া নেই। তখন তুমি মাধবকে চিনিতে পারিবে না এবং শরীরটাও দিতে পারিবে না। ফলে, তোমার মাধব নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে তুমি এই দুঃখ সহ্য করিতে পারিবে কি ?

দাদার কথার ভঙ্গীতে আমার চিত্তে এক ব্যথা এবং নৈরাশ্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। আমি কাঁদ কাঁদ হইয়া উত্তরে বলিলাম—না দাদা, এ দুঃখ তো আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। যাঁর সন্তোষের জন্য বারবার দেহধারণ করিয়া সাধন করিয়া আসিতেছি—এই অবস্থায় সেই মাধবই যদি বিমুখ হইয়া যায় তবে ত আমার সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমার সন্ন্যাস না নেওয়াই উচিত।

দাদা আমার উত্তর শুনিয়া প্রীত মনে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—ভাই মাধব যাহার ভাণ্ডারী তাহার আবার অভাব কিসের ? তুমি তাহার ভাণ্ডার হইতে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।

দাদা আরো বলিলেন—ভাই ! সাধু হওয়ার জন্য ব্যস্ত হও কেন ? তোমার মাধবের নাম করিয়াই লোকে সাধু হয়, তবে তোমার আর সাধু হওয়ার প্রয়োজন কী ?

দাদার এই উত্তরে আমার সাধু হওয়ার ইচ্ছা চিরদিনের মত দূরীভূত হইল।

৯

ভক্তি জ্ঞান-নিরপেক্ষ

শিক্ষাগুরু নরেনদা পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাইবার পূর্ব্বে একদিন তাঁর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—দাদা! আপনি আমার জ্ঞানদাতা গুরু। আপনার উপদেশেই যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আপনি চলিয়া গেলে হয় ত আমার এই জ্ঞানও লোপ পাইবে।

দাদা হাসিয়া বলিলেন—ভাই! আমি তোমায় জ্ঞান দিই নাই। পূর্ব্বজন্মে তুমি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলে। গুরু-কৃপায় আবরণ সরিয়া যাওয়ায় তোমার পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান তোমাতেই স্ফুরিত হইয়াছে মাত্র।

তোমার সাধু হওয়ার যে ইচ্ছা সেই সম্বন্ধে বলিতেছি—তুমি যদি সাধু না হও, তবে আমিও সাধু না আর তোমার ঠাকুরও সাধু নন।

দাদার এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলাম—দাদা! আপনি এবং শ্রীশ্রীঠাকুর যে সাধু তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দাদা হাসিয়া বলিলেন—তবে তুমিও যে সাধু হবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে দাদা পণ্ডিচেরী রওনা হইবেন। বিদায়ের সময় উপস্থিত। আমি দাদার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। দাদা আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"কোন ভয় করিও না। আমি আশীর্ব্বাদ

করিতেছি—হিন্দু ষড়দর্শন এবং যে কোন ধর্ম্মপুস্তক তুমি পড়িলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।”

দাদার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ পাইয়া কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলাম—আমার মত মূর্খের দ্বারা এ কাজ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অথচ দাদার আশীর্ব্বাদও অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

কাশীর লছমনপুরানিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ এবং শাস্ত্রালোচনা হইত। বহু পণ্ডিত, জ্ঞানী ভক্ত পাঠ শুনিতে আসিতেন। শ্রীযুক্ত নরেনদার পণ্ডিচেরী (অরবিন্দ আশ্রমে) আশ্রমে যাওয়ার কিছুদিন পরে আমি সেই শাস্ত্রালোচনা সভার পাঠক নির্ব্বাচিত হই।

এই উপলক্ষে দশ বৎসর কাল নিয়মিত ভাবে বেদান্ত, গীতা, ভাগবত ও বৈষ্ণব আচার্য্যগণের গ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা করি। যাঁহারা পাঠ শুনিতেন তাঁহারা আমার পাঠ শুনিয়া সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ করিতেন।

ইহা হইতেই আমার মনে হয়, নরেনদার আশীর্ব্বাদ সফল ও সত্যে পরিণত হইয়াছে।

মাধব পাগলা নাম কি করিয়া হইল

একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা আপনার "মাধব পাগলা" নাম কি করিয়া হইল? ইহা কী আপনার অবধূত অবস্থার নাম? এই নাম শ্রীশ্রীঠাকুর দিয়াছেন, না অন্য কেহ দিয়াছেন?"

মাধব পাগলা বলিলেন—ইহা আমার এই জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্ব জন্মের নাম।

আমি—তাহা আপনি কি করিয়া জানিলেন?

মাধব পাগলা ঃ আমার "পরিচয় ও বাণীতে" এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ইহার ব্যবহারিক দিকটা নানা প্রকার ঘটনা হইতে সংগৃহীত এবং সমর্থিত হইয়াছে।

একদিন আমার শিক্ষাগুরু শ্রীনরেনদা উপদেশ কালে বলিলেন—ভাই আমাদের দেশে সাধু চেনা কঠিন। কারণ অনেকদিন পূর্ব্বে ছাপড়া জেলার কোন এক গ্রামে এক সাধু ছিলেন। লোকে তাঁকে সাধু মনে না করিয়া পাগলা মনে করিত। সেই সাধু পাগলের মতই ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং "আমার মাধব খুব ভাল" সর্ব্বাবস্থাতেই এই কথা বলিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে মাধব পাগলা বলিয়া ডাকিত।

দাদার এই কথার কয়েক মাস পরে আমার ভাব সমাধি অবস্থায়, আমি ইষ্টকে কি নামে ডাকিব তাহা ঠিক করিতে না পারায় চিত্ত অস্থির হইয়া উঠে।

ঠিক কোন নামে ডাকিলে আমার মন তৃপ্ত হইবে, আমার ইষ্টের এত নাম থাকিতেও সে নাম কিন্তু কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিলাম না। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় কাশীর খোদাই চৌকী রাস্তার ধারে বটগাছের নীচে দিয়া যাইতেছি এমন সময় উপর হইতে কে যেন আমায় বলিয়া দিলেন, তুই আমাকে "মাধব" বলিয়া ডাকিস্ তবেই আমি সন্তুষ্ট হইব।

এই মাধব শব্দ শোনামাত্রেই, কোন বহুমূল্য জিনিষ হারাইবার দীর্ঘকাল পরে তাহার পুনঃ প্রাপ্তিতে লোকে যেরূপ আনন্দ লাভ করে, আমারও সেইরূপ "মাধব" শব্দের পুনঃ প্রাপ্তিতে (যাহা আমি এতদিন ভুলিয়াছিলাম) দেহ মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের পুলক শিহরণ জাগিয়া উঠিল। শরীর আমার যেন আনন্দের বেগ সহ্য করিতে পারিতেছিল না—অবশ হইয়া আসিতেছিল।

এমন সময় দৈবক্রমে শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দজী মহারাজ পিছন হইতে আসিয়া আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—কি গোপাল? শেষটাতে কি একেবারে পাগল হয়ে যাবে?

স্বামিজীর এই কথায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলাম—"স্বামিজী! পাগল আমি এখনও হই নাই। তবে মনে হয়, পাগল আমাকে হতেই হবে।" এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমার সাধন অবস্থার প্রথম হইতে এই স্বামীজীর সহিত আমার পরিচয় হয়। এই

স্বামিজীর নাম—স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী। ইনি কাশ্মীরের পরমহংস শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। স্বামিজী আমাকে সময় সময় উপদেশ করিতেন এবং আমার সাধন অবস্থার অনেক ঘটনা স্বামিজীকে বলিতাম। স্বামিজী আমার কথা শুনিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিবার ভঙ্গীতে বলিলেন—গোপাল ধৈর্য্য ধর। এত অল্পেই উতলা হইলে ভজন কি করিয়া করিবে? ভজন করিতে হইলে—ধৈর্য্য একান্ত প্রয়োজন।

আমি স্বামিজীর চরণে প্রণত হইলে তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু না বলিলেও, তিনি আমার তখনকার অবস্থা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বামিজী চলিয়া যাওয়ার পর, আমি তন্দ্রাগ্রস্তের মত চলিতে লাগিলাম এবং তন্দ্রাঘোরে সংস্কার সাক্ষাৎকার হইল এবং আমার অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের কথাই মনে পড়িল।

আমি বলিলাম—এই অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের কথাটী কী?

মাধব পাগলা বলিলেন—শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নরেনদার কথিত "মাধব পাগলাই" আমি। এই আমিই একটা ছেঁড়া কাথা গায়ে দিয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতাম। ছেলে ছোকরারা অনেক সময় আমাকে পাগল মনে করিয়া ঢিল ছুঁড়িত। ধুলা কাদা গায়ে দিত এবং মাধব পাগলা বলিয়া ডাকিত। অনেকে আবার আদর করিয়া সময় সময় খাইতেও দিত।

বিহার প্রদেশের ছাপড়া জেলার কোন এক গ্রামে শ্রীশ্রীমাধবজীউর মন্দির আছে। আমি সেই মন্দিরের পুজারী

ছিলাম এবং আমি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতও ছিলাম। সাধন করিতে করিতে দিব্য উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হই এবং ক্রমে উপরোক্ত অবস্থায় আসিয়া পড়ি।

লোকের তিরস্কারে বা প্রহারে বা আদরে আমার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইত না। সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতেই আমি বলিতাম আমার মাধব খুব ভাল। সেইজন্য সকলেই আমাকে মাধব পাগলা বলিয়া ডাকিত। উপরোক্ত এই "মাধব" শব্দ শোনা-মাত্রই আমার চোখের উপর এই বর্ণিত ছবিটী ভাসিয়া উঠিল এবং মাধব পাগলা সংস্কার আমাকে পাইয়া বসিল।

আমি অনেক সময় নির্জ্জনে থাকিলে স্বতঃই আমার মুখ হইতে "আমার মাধব খুব ভাল" এই কথা বাহির হইত। এমন কী রাস্তা চলিতে চলিতেও মনে মনে এই কথা আলোচিত হইলে, আমার দেহেও একটা পাগলের ভঙ্গী প্রকাশ পাইত। তাহা এই কাশী শহরের অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছে।

আমি—আপনি ত স্বপ্নযোগে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আপনি স্বপ্নযোগে কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি না?

মাধব পাগলা—হাঁ, স্বপ্নযোগেও ইহার আভাষ পাইয়াছি। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র দ্বারা ইহা পরে সমর্থিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নরেনদার পণ্ডিচেরী যাওয়ার পর, কাশীর সকরকন্দ গলির শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূজারী থাকাকালীন একদিন রাত্রে এই স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নটী এইরূপ :—

আমি ও যত্নবাবু (আমার প্রথম জন্মের পিতা) কোন এক নদীর ধারে মাঠে বেড়াইতেছি। এমন সময় হঠাৎ নদীর জল স্ফীত হইয়া উঠিল। এবং সমুদ্রের ঢেউ-এর ন্যায় প্লাবিত করিয়া প্রবলবেগে সমস্ত ভাসাইতে আরম্ভ করিল। প্রাণভয়ে আমরা উভয়ে ছুটীতে লাগিলাম।

যত্নবাবু বেশীক্ষণ ছুটীতে না পারায় ঢেউ-এ তলাইয়া গেলেন। আমি প্রাণভয়ে ছুটীতে ছুটীতে এক বনের ধারে উপস্থিত হইলাম। বনের মধ্য দিয়া কোন রাস্তা না পাইয়া নিরূপায় এবং কাতর হইয়া উপরের দিকে দুই হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম—মাধব, এবার বাঁচাও।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম—আমার সম্মুখে দীর্ঘকায়, মাথায় কাপড় জড়ান এক বৃদ্ধ চাষা দাঁড়াইয়া আছে। চেহারাটা দেখিতে অনেকটা ঠাকুরের মত। সে আমার সামনে আসিয়া বলিল—কি ঠাকুর? দেখছ কি? শীগ্‌গীর এখান থেকে পালাও। না হয়, বন্যার জলে ডুবিয়া যাইবে।

আমি কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলাম—পালাতে ত চাচ্ছি, কিন্তু রাস্তা যে পাচ্ছি না।

বৃদ্ধ তখন ঈষৎ হাসিয়া সেই বনের মধ্যে একটি পায়ে-হাঁটা সরু রাস্তা দেখাইয়া বলিল, এই রাস্তা দিয়া এক দৌড়ে বাড়ী চলিয়া যাও। তোমার মা তোমার জন্য ভাবিতেছেন। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই স্বপ্ন দেখার

প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে মাধব পাগলার মাতা ঠাকুরাণীর দেহান্ত হইয়াছে।)

আমি এই বৃদ্ধ চাষার কথামত প্রাণভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বন পার হইয়া এক বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাড়ীর সামনে একখানা টিনের ঘর সেই ঘরের বাহিরের দিকে একটা খোলা বারান্দা আছে। বারান্দার নীচেই রাস্তা। আমার মাতাঠাকুরাণী সেই বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং উৎকণ্ঠিতভাবে পুনঃ পুনঃ রাস্তার দিকে তাকাইতেছেন।

আমাকে দেখিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন—হাঁরে খোকা, বন্যায় ত সব ডুবে গেল ; তুই কি করে বেঁচে এলি ?

আমি মাকে উত্তরে বলিলাম—কেন মা ? মাধবকে বলিলাম, মাধবই আমাকে বাঁচাইয়া দিলেন।

মা একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—হাঁ, তোমার কথা মাধবকে রাখিতেই হয়।

আমি উত্তরে বলিলাম—কেন মা ?

মা বলিলেন—কারণ আছে।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। সেই সময় হইতে কেবলই মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—মাধব সর্ব্বশক্তিমান ভগবান। আর আমি সামান্য মানুষ। আমার কথা মাধবকে রাখিতে হয় ; ইহা ত এক অসম্ভব এবং অদ্ভুত কথা। আমিও ইহার কিছুই

বুঝিতে পারিতেছি না এবং মা-ও ত স্বপ্নে ইহার কারণ কী বলিলেন না।

এই স্বপ্ন দেখার কয়েক মাস পরে যখন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা পুরীধামে ছিলেন, তখন উপরোক্ত স্বপ্নটী এবং এই সম্পর্কীয় আমার নিজস্ব অনুভূতি ও এতদ্বিষয়ক অন্যান্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া মার নিকট একখানা পত্র দিলাম। সেই পত্রে আমার দুইটী বিষয় জিজ্ঞাস্য ছিল :—

১। আমি সেই মাধব পাগলা কি না?

২। স্বপ্নে আমার মায়ের কথিত "কারণ আছে"—এই কারণটি কী?

আমার এই পত্র পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা পুরী হইতে কাশীতে চলিয়া আসেন। ৺কাশী আশ্রমে আসিয়া তাঁহার ভক্ত এবং আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত পাগলা দাদাকে (শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) মা বলিলেন—তোমাদের মধ্যে মাধব পাগলা কে? তাহার পত্র পাইয়াছি। তাহাকে আমার সহিত দেখা করিতে বলিও।

পাগলাদার নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া আমি আশ্রমে গিয়া শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার সহিত সাক্ষাৎ করি! মা, আমার "গোপাল" নামই জানিতেন কিন্তু সেইদিন আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—কী তুই মাধব পাগলা? তোর পত্র পেয়েছি। পত্রের উত্তর এখন হবে না। আমি এক মাস পরে কাশীতে ফিরিয়া আসিব, তখন তোর পত্রের উত্তর হবে।"

ইহার এক মাস পরে তিনি কাশীর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আমি মায়ের আসার সংবাদ পাইয়া মার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং আমার অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের "মাধব পাগলা" নাম, মাধব শব্দ প্রাপ্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার নিজের অনুভূতি স্বপ্ন এবং উপরোক্ত ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে মাকে বলিলাম।

মা বিশেষ মনোযোগ সহকারে এবং স্থিরভাবে এই ঘটনাগুলি শুনিলেন। তাহার পর মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মা, আমি কি সেই মাধব পাগলা ?

মা উত্তরে বলিলেন—হাঁ, এখন হইতে তুই নিজেকে মাধব পাগলা বলিয়াই মনে করিস্।

আমি বলিলাম—তোমার কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বৃথা নিজেকে "মাধব পাগলা" বলিয়া ভাবিব কেন ?

এই কথা শোনামাত্র মার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। যেন ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া মা বলিলেন—কি ? আমার কথা মিথ্যা ? —না, আমার কথা মিথ্যা নয় ; তুই আমার কথা বিশ্বাস করিস্—তুইই সেই মাধব পাগলা।

তখন আমি বলিলাম—আচ্ছা মা মাধবকে আমার কথা রাখতে হয় কেন ?

আমার এই প্রশ্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার মুখে চোখে এক দিব্য প্রসন্ন ভাব খেলিয়া গেল। শান্ত সহানুভূতির সুরে মা বলিলেন—হাঁরে রাখবে না ? এর আগের বারে এত

ডাক ডেকেছিস্—এত সেবা করেছিস্—তোর কথা সে রাখবে না ? তোর কথা কি সে না রেখে পারে ?

মায়ের মুখে এ কথা শুনিবামাত্র, মাধবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরিয়া গেল। পুলক শিহরণে আমার দেহ মনে এক বর্ণনাতীত অবস্থার সৃষ্টি হইল। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ; মাকে প্রণাম করিয়া, আশ্রম ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—

"মন, তুমি এখন হইতে সংযত ও সাবধান হও। ভুলিয়াও মাধবকে যেন আর কোন কথা বলিও না। কারণ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, আর আমি সামান্য জীব মাত্র। এমতাবস্থায়, তাঁহার পক্ষে আমার কথা রাখা অপ্রীতিক এবং অশোভন। সুতরাং তাঁহাকে যেন আমার কথা রাখিতে না হয়। বরং তিনি আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই যেন রাখিতে পারি!" ভবিষ্যতে মাধবের নিকট কিছু চাহিব না—এই সঙ্কল্প করিলাম।

উপরোক্ত ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র আশ্রমে (যখন আশ্রমে থাকিতেন) আমি প্রত্যহই সকালবেলা এবং কোন কোনদিন দুই বেলা যাইতাম।

এই ঘটনার পর হইতে শ্রীশ্রীমা ও আশ্রমবাসীরা আমাকে "মাধব পাগলা" নামে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ মায়ের সহিত যখন আমার পূর্ব্বোক্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল তখন সেখানে

অনেক ভক্ত, শিষ্য এবং মায়ের দর্শনার্থী বাহিরের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এইভাবে সকলের নিকট আমার "মাধব পাগলা" নাম প্রচার হইয়া গেল। মায়ের আদেশে তখন হইতে আমিও নিজেকে মাধব পাগলা নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করি।

মন্তব্য ঃ—শাস্ত্রানুসারে দেখা যায়, সন্ন্যাস দিবার সময় গুরু শিষ্যের একটি নামকরণ করিয়া দেন। এখানেও ঠিক যেন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা গৃহস্থাশ্রমের গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার অবধূত অবস্থায় "মাধব পাগলা" নামকরণ করিলেন।

মাধব পাগলা ভাবদেহে (সিদ্ধদেহে) মাথুর ব্রাহ্মণ

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বাবাকে বলিলাম—বাবা! আপনি "পরিচয় ও বাণী"তে বলিয়াছেন যে, আপনি অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে মাথুর ব্রাহ্মণ। আপনি ইহা কিরূপে জানিলেন। শিক্ষাগুরু নরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দিয়াছিলেন কী ?—তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

উত্তরে বাবা বলিলেন—ইহা ভজনতত্ত্বের একটি নিগূঢ়তম রহস্য। সুতরাং সর্ব্বত্র ইহা প্রকাশ করা বিধেয় নহে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণও ইহাকে অত্যাশ্চর্য্য ও পরম গুহ্যতম বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তোমরা আমার স্নেহের পাত্র—তোমাদের ভজনে আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্যই অতি সংক্ষেপে ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতেছি।

দাদা এক সময়ে উপদেশ প্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন—তাহার (মাধবের) সহিত তোমার চেনা ও পরিচয় আছে, আর তুমি তাকে ভালও বাস; হয় ত আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইবে। (এই পুস্তকে ইহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।)

সেই সময় দাদার এই ইঙ্গিতপূর্ণ উপদেশের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই।

পরে, হ্লাদিনী শক্তির স্ফুরণে, আমার চিন্ময় সিদ্ধদেহ (ভাবদেহ) প্রকাশ পায়। সিদ্ধদেহে আমি মাথুর ব্রাহ্মণ। আমাতে মাত্র চারটী রস খেলে। তাহার মধ্যে বাৎসল্য রস প্রধান। শান্ত, দাস্য, সখ্য—এ তিন রস অপ্রধান। মাধুর্য্য রস আমাতে খেলে না।

বিভিন্ন সময়ে স্বতঃই আমার মুখ হইতে যে সব উক্তি বাহির হইত ও আজও হয় তাহা লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে যে, আমাতে বাৎসল্য রস প্রধান।

এ সম্বন্ধে দাদার কয়েকটী উক্তিও তোমাদের বলিতেছি (এই গ্রন্থে এ সব উক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে)—

১। তোমার আদরের, সেই শ্যামসুন্দরটি যদি এখন আমার সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়—আমি ত ভাই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিব।……

২। এত অল্পতেই যদি অধৈর্য্য হইয়া পড়, তবে তোমার আদরের শ্যামের সহিত খেলাধূলা করিবে কি করিয়া ?……

৩। তোমারই চোখের জলে তোমার মাধব নিয়ত অভিষিক্ত হচ্ছে।......

৪। তোমার মাধব নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে, তুমি এই দুঃখ সহ্য করিতে পারিবে কি ?......

৫। মাধব যাহার ভাণ্ডারী তাহার আবার অভাব কিসের ?......

৬। তোমার মাধবের নাম করিয়াই লোকে সাধু হয়—তবে তোমার আর সাধু হওয়ার প্রয়োজন কী ?......

মন্তব্য—(১) আমার মাধব (২) আমার মাধব খুব ভাল (৩) আমার মাধবের কল্যাণ হউক—এই ধরণের উক্তি প্রায়ই বাবার শ্রীমুখ হইতে শোনা যায়।

রাগানুগ ভজনের চিত্র

(স্বপ্নযোগে)

ভক্তের আমি মরে না

আমি একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি "পরিচয় ও বাণীতে" উল্লেখ করিয়াছেন যে, আপনি এ জন্মে "রাগানুগ ভজন" করিতেছেন। ইহা আপনি কি প্রকারে বুঝিতে পারিলেন ?

বাবা হাসিয়া বলিলেন—ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। আমি এক ভয়াবহ স্বপ্ন হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। স্বপ্নটী এইরূপ ঃ—

গঙ্গামহলের বাড়ীতে থাকাকালীন একদিন স্বপ্ন দেখিলাম—কোন এক নদীর ধারে আমি দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় জামা কাপড়-পরা ঠিক আমারই অনুরূপ একটি মূর্ত্তি (যেন আমিই) আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তার জামা কাপড় খুলিয়া ফেলিলাম। তখন একটি তীক্ষ্ণধার কাটারীর দ্বারা তার হস্ত পদাদি কাটিয়া ধড় হইতে পৃথক করিয়া রাখিলাম ; গলাটী কাটা হইল না। হাত পা কাটা সত্ত্বেও রক্ত পড়িল না, তাহার মুখেও কোন যন্ত্রণার ভাব প্রকাশ পাইল না এবং সে মরিলও না।

তাহার অদূরে শবদাহের জন্য একটি চিতা সাজান হইতেছিল। লোকেরা খোল করতাল সহযোগে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিল।

চিতা সাজান হইয়া গেল, কেবল শব তুলিয়া আগুন দিলেই হয়। লোকেরা আমায় চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিল—কৈ গো ঠাকুর! চিতা সাজান হইয়াছে। কে পুড়িবে—এস।

তাহাদের এই চীৎকার শুনিয়া আমি ধড়টীকে বলিলাম—তুমি এখন মর, তোমাকে পোড়ান হইবে।

ধড়টী মাথা নাড়িয়া বলিল—না, আমি ত মরিব না।

আমি বলিলাম—চিতা যখন সাজান হইয়াছে, তখন একজনকে ত পুড়িতেই হইবে। তুমি যদি না মর, তবে ত আমাকেই পুড়িতে হইবে।

ধড়টী হাসিয়া বলিল—না আমি মরিব না। তবে তুমিই যাইয়া চিতায় পোড়।

আমি এই কথা শুনিয়া তখন সেই ধড়টীর হাত পা সব জোড়া লাগাইয়া দিলাম। পূর্ব্বের ন্যায় জামা কাপড় পরাইয়া তাহার পিঠে এবং মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিলাম—তবে তুমি বাঁচিয়া থাক, আমি যাইয়া চিতায় পুড়ি।

এই কথা বলিয়াই আমি অদূরে চিতার উপর উঠিয়া, লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম। লোকেরা আমার উপর ভারী ভারী কাঠ চাপাইতে লাগিল। আমাকে ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিল—পাগলা! পুড়ে মরবি যে! খুব তাপ লাগবে কিন্তু। তাহাদের এই কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম—না, মাধবের জন্য পুড়লে মোটেই তাপ লাগে না।

আমার এই কথা শুনিয়া তাহারা আমার উপর কাঠ চাপানো

শেষ করিয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করিল। চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল —কিরে পাগলা! এখন আগুনের তাপ গায়ে লাগছে ত?

আগুনে আমার পরিধেয় কাপড় পুড়িয়া গিয়াছে এবং গায়েও তখন আগুন লাগিতেছে, কিন্তু শরীরে আমার অগ্নির তাপ মোটেই অনুভূত হইতেছে না। প্রজ্বলিত চিতার চারিদিকে সেই সময় লোকেরা হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে।

আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলাম—কৈ তাপ লাগছে না ত। দেখ্‌লি, **মাধবের জন্য পুড়লে মোটেই তাপ লাগে না।**

চিতায় পুড়িতেছি এই অবস্থায় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত এবং মনে একটু ভয়ের ভাবও লাগিয়া আছে। স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেলে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম এবং বিচার দ্বারা বুঝিতে পারিলাম—ইহাই **রাগানুগ ভজন বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের সুস্পষ্ট চিত্র।**

যতক্ষণ দেহে আমিত্ব বোধ থাকে ততক্ষণ এই রাগানুগ ভজন সিদ্ধ হয় না। বোধের দ্বারা দেহ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারিলে অর্থাৎ দ্বন্দ্বাতীত বা গুণাতীত হইলেই এই রাগানুগ ভজন সিদ্ধ হয় বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন সম্ভব হয়। কারণ জীবের ত্রিতাপের কোন প্রকার তাপই সাধককে উপরোক্ত অবস্থায় স্পর্শ করিতে পারে না। **সে কেবল প্রেমভক্তির দ্বারাই সর্ব্বাবস্থায় চালিত হয়।**

একমাত্র রাগানুগ ভজনশীল সাধুই এই স্বপ্নদৃষ্ট চিত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। কারণ ভাষায় ইহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা সম্ভবপর হইল না।

মাধব পাগলার পূর্ব্ব নয় জন্মের স্মৃতিলাভের বিবরণ
(স্বপ্নযোগে)

আমি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— বাবা! আপনার "পরিচয় ও বাণীতে" উল্লেখ করিয়াছেন যে, আপনি দশটী জন্মগ্রহণ করিয়া "রাগানুগ ভজন" করিতেছেন। ইহাই আপনার শেষ জন্ম। এ বিষয় আপনি কি করিয়া জানিতে পারিলেন?

উত্তরে বাবা বলিলেন—এই জ্ঞানের মূল বিষয়টী আমি স্বপ্নযোগে জানিতে পারিয়াছি। বাকী অংশসমূহ প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীযুক্ত নরেনদা ও শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের উপদেশাদি হইতে ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হইয়াছি।

বাবাকে আমি বলিলাম—আপনার এই স্বপ্নটী বলিতে যদি বাধা না থাকে, তবে কৃপা করিয়া আমাদের নিকট তাহা খুলিয়া বলুন—কারণ আমরা ইহাকে অবিশ্বাস্য এবং প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি।

আমার এই কথা শুনিয়া বাবা মৃদু মৃদু হাসিলেন এবং উত্তরে বলিলেন—আমার মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর আমি প্রায় দুই বৎসর গঙ্গামহলে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম। পরে

আমার বন্ধু ৺যদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁহার বাড়ীতে ৩২/৭০ পাতালেশ্বর এই ঠিকানায় আসিয়া থাকিলাম। এই বাড়ীর প্রবেশ দ্বার পার হইয়া নীচের তলায় বাঁদিকে একটী ছোট বারান্দা আছে। আমি সেই বারান্দাতেই শুইতাম। সেই সময় আমার শরীরটা প্রায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের আবেশে আবেশিত হইয়া থাকিত। সেইজন্য মানসিক অশান্তি, ভয় ভাবনা কিছুই ছিল না।

একদিন বিকেলবেলা হইতে আমার শরীরটা বিশেষ ভার ভার (আবেশিত অবস্থা) বোধ হইতে লাগিল এবং মনও যেন বেশ হাল্কা ও প্রসন্ন ছিল। রাত্রি প্রায় ১১টায়, আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। শুইবার কিছুক্ষণ পরেই তন্দ্রাঘোরে এই স্বপ্নটী দেখিলাম।—

আমি একটি শীর্ণকায়া নদীর ধারে প্রান্তরে বসিয়া আছি। প্রান্তরের ঘাসগুলি খুব সজীব, ঘন, মোলায়েম ও গাঢ় শ্যামল বর্ণ। তাহার অদূরে মনোরম সুদৃশ্য উজ্জ্বল বিরাট পুরী; দূর হইতে দেখিলে রাজার বাড়ী বলিয়া মনে হয়। নদী অপ্রশস্ত এবং জল একটু ঘোলা; দেখিলে মনে হয় যেন বৃষ্টির জল বহিয়া আসিতেছে। জলের বেগ আছে কিন্তু খুব বেশী নয়। নদীর অপর পারে এ পার অপেক্ষা কম আলো। আমি একটী পাঁচ বৎসরের উলঙ্গ বালক—সেই অবস্থায় সারাদিন এই প্রান্তরে একাকী বসিয়া আপনমনে খেলিতেছি।

চমকিত হইয়া দেখিলাম যেন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া

আসিতেছে। একটু ভীত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলাম —তাইত এখন কোথায় যাই?

এমন সময় বিস্মিত হইয়া দেখিলাম কে একজন স্ত্রীলোক গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ, পরিধানে লাল চওড়া পেড়ে শাড়ী, হাতে শাঁখা ও সোনার চুড়ি, গায়ে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার, কপালে উজ্জ্বল সিন্দূরের ফোঁটা, মাথায় সামান্য একটু ঘোমটা দেওয়া আছে। তিনি আমার হাত ধরিতেই তাঁহার পায়ের দিকে আমার নজর পড়িল। দেখিলাম—পায়ে আলতা পরা। অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই, তিনি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিলেন—চল, আমার সঙ্গে এসো, কোন ভয় নাই। (এই স্ত্রীলোকটীর গায়ের রং, মুখের ভঙ্গী, দৈহিক গঠন অনেকটা যতুবাবুর স্ত্রীর মতই।)

আমি যাইতে দ্বিধা বোধ করায় তিনি একটু জোর করিয়া আমাকে টানিয়া নদীতে নামিলেন। নদীতে আমার প্রায় কোমর জল।

নদীতে নামিয়া স্ত্রীলোকটীর হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে আমার পায়ের নীচে কাঁটা, কাঁকর ইত্যাদি ফুটিতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে গর্ত্তে পা পড়িতে লাগিল।

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—মাধব, তোমার এ রাস্তা ত বড়ই খারাপ। আমার ত খুবই কষ্ট হইতেছে। আমাকে এ রাস্তায় কতবার যাতায়াত করিতে হইবে?

উপর হইতে দৈববাণী হইল—তোমাকে দশবার এ রাস্তায় যাতায়াত করিতে হইবে। ভয় করিও না, আমার অদৃশ্য শক্তি সর্ব্বদাই তোমাকে রক্ষা করিবে।

এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া ধীরে ধীরে স্ত্রীলোকটীর সহিত যাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে, একটি বাড়ীর সামনে খালের ঘাটের সিঁড়ি ধরিয়া জল হইতে উপরে উঠিলাম।

সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকটি আমার পায়ের এবং গায়ের কাদা ধোয়াইয়া দিয়া সযত্নে নিজের আঁচল দিয়া আমার গায়ের জল মুছিয়া দিলেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিয়া সেই বাড়ীর টিনের ঘরের সামনে আমাকে দাঁড় করাইয়া বলিলেন—যাও, তুমি এই ঘরে গিয়া বসো।

স্ত্রীলোকটীর কথামত সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—সেই ঘরটী স্যাকরাদের নানা যন্ত্রপাতিতে ভরা। বুঝিলাম ইহা একটি স্যাকরার দোকান। তিনজন লোক সেই ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল। খোলা জানালা দিয়া দেখিতে পাইলাম সেই বাড়ীর ভিতর দালান ও অনেকগুলি টিনের ঘর আছে।

সম্মুখে দেখিলাম এক ব্যক্তি (চেহারা অনেকটা যদুবাবুর মত তবে একটু স্থূলকায় এবং একটু রং ফর্সা) নেহাইর উপর কি যেন সোনার জিনিস রাখিয়া হাতুড়ী দিয়া পিটাইতেছিলেন। দেখিয়াই বুঝিলাম ইনি এই বাড়ীর মালিক। তাহার বাঁদিকে, খোলা দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—পায়ে খড়ম, পৈতাটী বেশ শুভ্র চকচকে, মাথায় একখানা ভাঁজ

করা ভিজে গামছা ; মুখখানা দেখিলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া ভ্রম হয়। তবে চেহারায় যেন একটু পার্থক্য আছে। উপরোক্ত ব্রাহ্মণকে স্যাকরা কি যেন বলিতেছেন। আমি পাঁচ বৎসরের উলঙ্গ বালক হইলেও সেই ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলাম।

তিনি আমার কাঁধে হাত রাখিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত মালিকের দিকে দেখাইয়া ধীর ও শান্তভাবে বলিলেন—ওকে প্রণাম কর, ওরা ধনী গৃহস্থ. তোমাকে আদর যত্নেই রাখিবে, চিন্তা করিও না। ব্রাহ্মণের কথামত সেই বাড়ীর মালিককে যাইয়া প্রণাম করিতেই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সেই মালিকের মুখের ভঙ্গী ও দৈহিক গঠন ছাড়াও পায়ের আঙ্গুল, চামড়ার রং এবং খস্‌খসে ভাব ইত্যাদি মনে করিতেই বুঝিতে পারিলাম, আমার বন্ধু যতুবাবুর পাও এইরূপ লক্ষণযুক্ত।

এই তন্দ্রা ভাঙ্গিবার কিছুক্ষণ পরে আমি উপরের ঘরে শায়িত যতুবাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে নীচে আসিবার জন্য চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। রাত্রি তখন প্রায় ১২টা।

যতুবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন—এত রাত্রিতে আবার ডাকাডাকি করিতেছেন কেন? যাহা বলিবার তাহা কাল সকালে বলিবেন।

আমি বলিলাম—না, আপনারা নীচে চলিয়া আসুন।

আমি বিশেষ জেদ করায় তাঁহারা তুজনে নীচে নামিয়া আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইলেন। আমি সুইচ্‌ টিপিয়া আলো জ্বালিলাম এবং তুইজনেরই পা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া

দেখিতে পাইলাম যে, স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রীলোকটীর এবং মালিকের পায়ের সহিত যতুবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর পায়ের গঠন, আঙ্গুল, চামড়ার খস্‌খসে ভাব ইত্যাদির যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই স্বপ্নদৃষ্ট মালিক এবং স্ত্রীলোক—ইহারাই আমার প্রথম জন্মের পিতা ও মাতা। যতুবাবু ও তাঁহার স্ত্রী তুইজনই এই পাগলের কাণ্ড দেখিয়া কৌতুক বোধ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন আমাদের পায়ে কি দেখিতেছেন ?

আমি এই কথা শোনামাত্রই তাঁহাদের উভয়ের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিলাম।

তাঁহারা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আপনার কি কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই। আমরা আপনার চাইতে বয়সে ছোট—আপনি আমাদের প্রণাম করিয়া অকল্যাণ কেন করিলেন ?

আমি বলিলাম—আপনারা আমার প্রথম জন্মের পিতামাতা। এ জন্মেও আপনারা আমার দূর সম্পর্কের কাকা ও কাকীমা; গুরুজন। সুতরাং আপনাদের অকল্যাণ হইবে না। আমার এ কথা শুনিয়া যতুবাবু বলিলেন—আপনি দেখিতেছি সত্য সত্যই পাগল হইলেন, এই সব কথা বলিলে লোকে আপনার গায়ে ঢিল ছুঁড়িবে।

আমি তাঁহাদিগকে আমার বিছানার নিকট বসাইয়া আমার স্বপ্নের বৃত্তান্তটী খুলিয়া বলিলাম এবং তাহাতে আমার স্বপ্নদৃষ্ট তাঁহাদের পায়ের সৌসাদৃশ্য বিষয়টী যথাযথ বলিলাম !

ব্যবহারের প্রত্যক্ষ দিকটীও দেখাইয়া বলিলাম—আজ প্রায়

১৫ বৎসরের অধিককাল আমি ও মা আপনাদের সহিত পরিচিত। যতুবাবুর স্ত্রীকে বলিলাম, তোমার ঠাকুরমা, তোমার মা এবং দিদিমা ইত্যাদি সকলেই আমাকে সাধু মনে করিয়া আমার পায়ের ধূলা নিতেন। কিন্তু তোমাদের তুজনকে কখনও পায়ের ধূলা নিতে দিই নাই। এ কথাও বোধ হয় তোমাদের মনে আছে এবং এজন্য তোমরা তুঃখিত হইয়া আমার মায়ের নিকট নালিশও করিয়াছিলে। মা আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি মাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার পায়ের ধূলা নিতে আসিলেই আমার যেন কেমন একটা ভয় হয়। তোমাদিগকে আমার পায়ের ধূলা দেওয়া উচিত নহে কে যেন এই ভাব আমার মনের মধ্যে জাগাইয়া দিত।

শান্ত এবং গম্ভীরভাবে যতুবাবুকে বলিলাম—আপনি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখুন, আমি আপনার চাইতে বয়সে বড়, শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। তথাপি আমি আপনার আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়া আসিতেছি। আমি আপনার বন্ধু হইয়াও পুত্রের ন্যায় আপনার ঘর সংক্রান্ত এবং দোকানের কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া আপনার সেবা করিতেছি। আপনিও আমার বন্ধু হইয়াও আমার অভাব অনটনে এবং বিপদে আপদে পিতার ন্যায় স্নেহশীল হইয়া আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আপনার স্ত্রীর অসুখের সময় তাঁহাকে মায়ের মত সেবা করিয়াছিলাম বলিয়া আপনি না বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আমাকে উপহাস করিয়াছিলেন?

আমি আপনার কথার উত্তরে একটু দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলাম যে, আপনার স্ত্রীর শরীর সম্বন্ধে আমার কোন রূপ সংস্কার নাই। আমার নিজের গর্ভধারিণী মায়ের শরীরের মত অনায়াসেই ইঁহার শরীরটার সেবা যত্ন করিতে পারি।

তখন না আপনারা উভয়েই আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন আজ তাহার প্রমাণ পাইলেন ত? আপনারাই এই স্বপ্নদৃষ্ট স্যাকরা দম্পতি, আমার প্রথম জন্মের পিতামাতা। অপুত্রকহেতু পুরীধামে যাইয়া একটি পুত্র কামনা করিয়া ধর্ণা (হত্যা) দিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় আমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। এখন হইতে আপনারা উভয়েই আমাকে সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং মাধব পাগলা বলিয়া ডাকিবেন। তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব।

স্বপ্নে আপনার বাড়ীর যে পরিবেশ দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয়, আপনি জাতিতে স্বর্ণকার এবং পূর্ব্ব বাংলার কোন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

বাবার নিকট হইতে এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া কৌতূহলবশতঃ আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা বাবা! ইঁহারাই যে আপনার প্রথম জন্মের পিতামাতা এবং স্বর্ণকার দম্পতি ছিলেন ও পুরীধামে ধর্ণা দিয়েছিলেন—এ সব কথা আপনি কি করিয়া জানিলেন?

উত্তরে বাবা বলিবেন—শ্রীগুরুকৃপায় তন্দ্রাযোগে পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত—স্থান, কাল, পরিবেশ ও দেহাদি

দর্শন হইতে সংস্কার সাক্ষাৎকার হয়। এই সংস্কার সাক্ষাৎকার হইতেই আমি এই সব বিষয়ের স্মৃতি লাভ করিয়াছি। ইহা সম্বিৎশক্তির বিলাসমাত্র। এই সম্বিৎশক্তির (ভক্তিশক্তি) প্রভাবেই সাধক জন্মান্তর স্মৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন।

জন্মান্তর স্মৃতি প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শিক্ষাগুরু নরেন্দ্রনাথের

মাধব পাগলাকে ইঙ্গিতে উপদেশ দান

জন্মান্তর স্মৃতিপ্রসঙ্গে বাবা আরও বলিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর ৺কাশীধামে আসিলে আমি ও যদুবাবু প্রায়ই একসাথে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে যাইতাম। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখিলে ঠাকুরের ভাবান্তর দেখা যাইত। তিনি অপলকদৃষ্টিতে প্রায় পাঁচ মিনিটকাল আমার বন্ধু যদুবাবুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেন। এই নিরীক্ষণের গূঢ় অর্থ সে সময় আমরা কেহই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তবে আমরা দুজনেই বিশেষভাবে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যদুবাবুও মধ্যে মধ্যে এ বিষয় লইয়া কৌতুহলবশতঃ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। আমিও তাঁহাকে ইহা বুঝাইতে পারি নাই।

পরে যখন সম্বিৎশক্তির প্রভাবে আমার জন্মান্তর স্মৃতি উদ্‌ঘাটিত হয় তখন কথা প্রসঙ্গে যদুবাবুকে ঠাকুরের এই নিরীক্ষণের বিশেষ অর্থটী বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম।

"আমরা দুজনে পিতা ও পুত্র হইয়াও মায়াশক্তির প্রভাবে এই জন্মে পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে না পারিয়া বন্ধু হইয়াছি ও বন্ধুবৎ আচরণ করিতেছি—এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বোধ হয় এরূপ অপলক দৃষ্টিতে আপনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেন। অথবা আমাকে পূর্ব্বজন্মসংক্রান্ত স্মৃতির উদ্ঘাটনের নিমিত্ত এরূপ ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।"

আমার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নরেনদা-ও এ বিষয়ের পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন। তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বোঝা যাইবে।

একবার বিশেষ কারণে আমাকে যথার্থ হিতকর অথচ অপ্রিয় সত্য কথা যদুবাবুকে বলিতে হয়। তাহার ফলে ৺যদুবাবুর আমার ঝগড়া বা মনোমালিন্য হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই আমার সহিত নরেনদার নিকট যাইতেন ও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

একদিন তিনি নরেনদার নিকট আমার এই বিষয় লইয়া নালিশ করেন। সমস্ত বৃত্তান্ত নরেনদার কাছে বিবৃত করিয়া যখন তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন সেই সময় আমি সেখানে গিয়া উপস্থিত হই।

আমার মানসিক সুস্থতা ছিল না—তাহার কারণ, ৺যদুবাবু আমাকে পাঁচজনের সম্মুখে বিশেষভাবে উক্ত কারণেই অপমান করিয়াছিলেন।

আমার অপ্রিয় সত্যভাষণের জন্যেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম।

ঘটনার তিন চার দিন পর্যন্ত এক মানসিক জ্বালা অনুভব করিতেছিলাম।

দাদার নিকট আসিতেই যিনি প্রশ্ন করিলেন—কি গোপাল ভাই? যদু ভাই যাহা বলিল তাহা কি সত্য?

যদুবাবু যে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কিছু বলিবেন না আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় আমি বলিলাম—তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। ইহার উপর আমি আর কিছু বলিতে চাহি না।

দাদা নিশ্চিন্ত হইবার জন্য পুনরায় বলিলেন—তুমি কী কিছুই বলিবে না?

আমি বলিলাম—না দাদা, আমার কিছুই বলিবার নাই।

যদুবাবুকে দাদা বলিলেন—সামান্য বিষয় লইয়া গোপাল ভাইয়ের সহিত তোমার ঝগড়া করা উচিত নহে। তোমরা দুজনেই ইহার নিষ্পত্তি করিয়া লইবে। ইহার পরে দাদা নিজেই ইহার নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছিলেন এবং আমাদের দুজনকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন যে, আমরা যতদিন ৺কাশীতে থাকিব ততদিন পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িব না; পরন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রয়োজনে সাহায্য করিব।

লৌকিক দৃষ্টিতে ইহা অতি সাধারণ ঘটনা বলিয়া মনে হইলেও, ইহা যে আমার জন্মান্তর স্মৃতি উদঘাটনের নিমিত্ত দাদা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—তাহা সম্বিৎশক্তির স্ফুরণে—পূর্ব্বজন্ম-জনিত সংস্কার সাক্ষাৎকার হওয়ায়ই নিশ্চিতভাবে জানিয়াছি।

পরিশিষ্ট

মাধব পাগলার বিচিত্র ধরনের অনশন

কেন না—ইহা স্বেচ্ছাকৃত নহে

যে শক্তির দ্বারা ভজন হয়—এই অনশন সেই ভজনশক্তির বিলাসমাত্র। ইহা সামান্য ব্যবহারিক অনশন নহে, বা কোন ব্যাধি নহে। কারণ ডাক্তারগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—ব্রহ্মে লীন থাকিলে আহারের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং মুক্ত পুরুষ অথবা ভক্তের পক্ষেই ইহা সম্ভব। কিন্তু ইহা নিজস্ব অভ্যাসযোগের দ্বারা সম্ভব নহে।

অনেক সাধু মহাপুরুষকে এবং শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাকে এই অনশন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে কেহই এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

তবে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার জীবনী পাঠে জানা যায় যে, সাধকের শরীরকে অধিকতর সাধন উপযোগী করিবার জন্য গুরুশক্তির প্রভাবে এই প্রকার অনশন হইয়া থাকে।

মাধব পাগলার এই প্রকার অনশনের বৈশিষ্ট্য এই যে, অনশন আরম্ভের কয়েক দিন পর্যন্ত একটু চা ও জল খাইতে পারেন পরে তাহাও একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এরূপ অনশন অবস্থায় সামান্য কিছু আহার্য্য গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা বমি হইয়া যায় এবং তিনি অসুস্থ বোধ করেন।

অনশন অবস্থায় তাঁহার দেহ সুস্থ, শরীর অধিকতর হাল্কা এবং মন বিশেষ এক আনন্দের আবেশে আবেশিত থাকে।

অনশন আরম্ভের ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত দেহের কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হয় না। তবে অনশন দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইলে শেষের দিকে শরীর একটু কৃশ দেখায়। অনশন ভঙ্গের দিন তিনি সাধারণভাবে ডাল ভাত তরকারী, এ সব আহার্য্য পেট পুরিয়া গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার কোনরূপ অসুস্থতা বোধ হয় না। শরীর স্বাভাবিক ও সুস্থ থাকে। অনশন ভঙ্গে কখনও তাঁহাকে কোনরূপ লঘু পথ্য গ্রহণ করিতে হয় নাই।

দীর্ঘ দিন এইরূপ অনাহারের পর সাধারণ লোকে এই প্রকার খাদ্য গ্রহণে অসুস্থ হইয়া পড়ে কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

অনশনের পূর্ব্বে শরীরের যে অবস্থা, অনশনে সেই একই অবস্থা এবং খাদ্য গ্রহণের পরও কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার।

অনশন আরম্ভের ২।১ দিন পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারেন এবং অনশন চলিতে থাকাকালীন (অনেকে জোর করিয়া এক আধ কণা খাদ্য দিয়া পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছেন) কোন কিছু গ্রহণ করিতেও সক্ষম নহেন।

১। ১৩৫৯ সালের আষাঢ় মাসে মাধব পাগলার এই অনশন প্রথম আরম্ভ হয়। এই অনশন স্থায়ী হয় একুশ দিন।

২। ১৩৬০ সালে এই প্রকার অনশন দুইবার হয়। একবার ১৩ দিন এবং আরেক বার ৯ দিন।

৩। পুনরায় ১৩৬১ সালে ফাল্গুন মাসে ২০ দিন, আরেকবার ১৩৬১ সালে ভাদ্র মাসে হয় ১৮ দিন।

৪। ১৩৬২ সালে দুইবার হয়। প্রথমবার ১৫ দিন, দ্বিতীয় বার ৩৬ দিন স্থায়ী হয়।

৫। ১৩৬৩ সালে দুইবার হয়। প্রথমবার আষাঢ় মাসে ১১ দিন আর দ্বিতীয়টী দুর্গাপূজার শুক্লা পঞ্চমী হইতে লক্ষ্মীপূজার পরে কৃষ্ণা প্রতিপদ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

৬। ১৩৬৪ সালে শ্রাবণ মাসে ৯ দিন এবং অগ্রহায়ণে ১৫ দিন।

৭। ১৩৬৫ সালের অশ্বিন মাসে ১৪ দিন।

৮। ১৩৬৭ সালের ২২শে চৈত্র বুধবার হইতে এই অনশন আরম্ভ হয়। এই অনশন ২৪ দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

৯। ১৩৭৪ সালের ১১ই চৈত্র হইতে অনশন আরম্ভ হইয়াছে। ৩৭ দিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে এবং ইহাই তাঁহার শেষ অনশন।

মন্তব্য :—এই অনশন সম্বন্ধে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যতটুকু জানিয়াছি তাহাই পাঠকের অবগতির জন্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইল।

শ্রীশ্রীমাধব পাগলার কথিত ভজনের উপদেশ

অষ্টাঙ্গ ভজন

শ্রদ্ধা—শ্রৎ সত্যম্ ধীয়ত ইতি শ্রদ্ধা। অহর্নিশ ভগবৎ অভিমুখী হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা বলে।

সাধুসঙ্গ—সদ্‌গুরু লাভ।

ভজন ক্রিয়া—নাম, জপ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি।

অনর্থ নিবৃত্তি—দেহাভিমান না থাকা বা দেহাভিমান শূন্য অবস্থা।

নিষ্ঠা—নিশ্চয়রূপে থাকা বা দৃঢ় বিশ্বাস।

রুচি—ইষ্টে অনুরক্তি বা রতি।

আসক্তি—নামে বা ইষ্টে ঐকান্তিক আগ্রহ।

ভাব—ভক্তির গাঢ় অবস্থাকে ভাব বলে। ভাবের গাঢ় অবস্থার নাম—**প্রেম**।

সাধ্য কি

(ক) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রীতির উদ্দেশ্য লইয়াই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিও।

(খ) তাহা হইলে ত্যাগ বৈরাগ্য আসিবে। বিষয়াসক্তি শিথিল হইবে।

(গ) ত্যাগ বৈরাগ্য আসিলে নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী হইবে।

(ঘ) নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতেই সন্ন্যাস যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক) সর্ব্ববিধ সংস্কারমুক্ত পুরুষকেই যথার্থ সাধু বলা হয়।

(খ) প্রকৃতির অধীন থাকাই সংস্কার এবং তাহা হইতে দ্বৈতবোধ জন্মে।

মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হওয়ার নামই সংস্কারমুক্ত।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(গ) সংস্কারমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মস্থ (স্বরূপস্থ) হইতে পারা যায় না।

(ঘ) নাম জপ ও ধ্যানাদি দ্বারা চিৎচক্ষু উন্মীলিত হইলেই সংস্কারমুক্ত হওয়া যায়।

(ঙ) চিত্তশুদ্ধি হইলেই অখণ্ড জপ ধ্যান হয়।

গভীর ভাবে চিন্তার নাম—ধ্যান। তাহাতে স্থিত থাকার নাম ধারণা। বিষয়বস্তু হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া ধ্যেয় বস্তুতে স্থিত করার নাম—প্রত্যাহার।

সমাধি তুই প্রকার :—

(১) সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত

(২) নির্ব্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত

মন যখন ধ্যেয় বস্তুর সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় বা ধ্যেয় বস্তুতে লীন হয় তাহার নাম সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কেবল ধ্যেয় বস্তুর রূপটী থাকে। ধ্যেয় বস্তু কি? গুরু ও ইষ্ট (বা ব্রহ্ম)।

অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প—সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাকান্তে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ত্রিপুটী ভেদ হইয়া যখন নিরাকার ব্রহ্ম-সত্তায় চিত্ত নিদিধ্যাসিত হয় অর্থাৎ লয় হয়, তখন তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখন চিত্তে চিৎ সত্ত্বারই স্ফুরণ থাকে, বিষয়ের অধ্যাস থাকে না।

চিত্তং চিতং বিজানীয়াৎ তকাররহিতং যদা।
তকারঃ বিষয়াধ্যাসেঃ জবারাগ যথামনৌ॥

অসংপ্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত্ত তকাররহিত হইয়া চিতে পরিণত হয়। মায়া অধ্যাস হইলে চিত্ত, আর মায়ামুক্ত হইলে চিৎ হয়।

মায়ার কাজ কি ?

মায়ার কাজ হচ্ছে আবরণ এবং বিক্ষেপ অর্থাৎ শুদ্ধ চিৎ-সত্ত্ব কে মায়া আবরিত করিলেই দেহাদিতে আমি ও আমার এই বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইহা অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়ার এক অত্যাশ্চর্য্য খেলা। ইহাকেই 'ত'-কার বা বিষয়াধ্যাস বলিয়া উক্ত শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সমাধির অবস্থা :—

প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ং
সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসম্ সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।

অন্বয় :—

প্রভাশূন্যং (নামরূপ প্রকারাদিরহিত) মনঃশূন্যং (সঙ্কল্প ও বিকল্পরহিত), বুদ্ধিশূন্যং (আসক্তিশূন্য অর্থাৎ সুখাসক্তি ও

জ্ঞানাসক্তিরহিত), নিরাময়ং (চিত্তবৃত্তিরহিত), সর্ব্বশূন্যম্ (স্বপ্ন জাগ্রত সুষুপ্তি—অবস্থাত্রয় রহিত), নিরাভাসম্ (আভাসবিহীন) আভাস চৈতন্যও নাই। এস্থলে আভাস চৈতন্যও অহংভাব হইতে মুক্ত নয়—ইহাই বুঝান হইতেছে। তত্ত্বতঃ নিরাভাস (শুদ্ধচৈতন্য বা চিৎস্বরূপ) সমাধিস্থস্য লক্ষণম্ (ইহাই সমাধিস্থের লক্ষণ)।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

প্রভাশূন্য, মনঃশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, নিরাময়, সর্ব্বশূন্য নিরাভাস —ইহাই সমাধির লক্ষণ।

ভাবার্থ ঃ—

সমাধি অবস্থায়—নাম রূপ প্রকারাদি, মনের সঙ্কল্প বিকল্প, সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি; এ সব আর থাকে না। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ের ঊর্দ্ধে—গুণাতীত শুদ্ধ চৈতন্য বা চিৎস্বরূপে সাধক স্থিত থাকেন।

সেই সমাধিস্থ সাধক জীবন্মুক্তি পাইয়া বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকেন।

সমাধি অবস্থায় থাকে কি ?

শুদ্ধ চৈতন্যই থাকে। অখণ্ড জপ ধ্যানের পর স্বরূপানুভূতিই থাকে।

মন কাহাকে বলে ?

কামঃ, সংকল্পঃ, বিচিকিৎসা,
শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা, ধৃতিঃ, অধৃতিঃ

হ্রীঃ, ধীঃ, ভীঃ ইত্যেতৎ
সর্ব্বং মনং—

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৫।৩

সংকল্প, বিকল্পাত্মক মন অর্থাৎ মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই হচ্ছে সংকল্প এবং বিকল্প।

দেহের ধর্ম্ম কি ?

(১) জন্ম (২) স্থিতি (৩) বুদ্ধি (৪) ক্ষয় (৫) অপক্ষয় (৬) নাশ।

দেহের সঙ্গী কি ?

শোক, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা ও মরণ।

ত্রিদণ্ড কি ?

(১) কায় (২) মন (৩) বাক্য

যিনি এই তিনের দ্বারাই ভগবৎ উপাসনা করেন তাঁহাকে ত্রিদণ্ডী বলা হয়। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা উপাসনাই —সার্থক উপাসনা।

জপের ক্রম—

১। বৈখরী—মুখে মুখে জপ করা।
২। মধ্যমা—মনে মনে জপ করা।
৩। পশ্যন্তি—চিত্তপুটে জপ।
৪। পরা—স্বরূপ অনুভূতিতে স্থিতি।

ভজন দুই প্রকার :—

১। বৈধী—শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ পালনপূর্ব্বক অথবা

শ্রীশ্রীগুরুর আদেশানুযায়ী যে ভজন তাহাই বৈধী ভজন।

২। রাগানুগ ঃ—

শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অর্থাৎ রাগানুগ ভজনে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই কেবল প্রেমের দ্বারাই সেই ভজন হয়। কারণ জ্ঞান ও কর্ম্মের বৃত্তি বা সংস্কার, প্রেমকে আবরিত করিতে পারে না।

ভক্তি বস্তুটি কী? এবং উত্তমা ভক্তি কাহাকে বলে?

ভজ ধাতুর উত্তর ভাবে ক্তি প্রত্যয় করিয়া ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ভজ-ইত্যেব বৈ-ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। ভজ অর্থে সেবা। ভগবৎ সেবাকেই ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

নারদভক্তিসূত্রে "ওঁ পূজাদিষ্বনুরাগঃ" অর্থাৎ ভগবৎ পূজা দিতে অনুরাগ; "ওঁ কথাদি ষ্বিতি (গর্গ) অর্থাৎ ভগবৎ কথাদিতে অনুরাগ এবং শাণ্ডিল্য সূত্রে "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি—ইত্যাদি বাক্য সম্যক্‌রূপে ভগবৎ সেবাকেই ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। অনুরাগ অর্থে প্রিয়তমের আনুকূল্য বিধায়ক সেবা।

নারদীয় পাঞ্চরাত্রোক্ত "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎ-পরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" অর্থাৎ সর্ব্বোপাধি হইতে মুক্ত ভগবৎপরত্ব বশতঃ নির্ম্মল ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই ভক্তি।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "গুরূপদিষ্টমন্ত্রবতী ভক্তি-শাস্ত্রোক্ত বিধ্যনুসারিণী অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিতা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অনিমিত্তা স্বাভাবিকী শ্রীভগবানে আনুকূল্যময়ী যে বৃত্তি—তাহাকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণও অন্তরে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করিতেই উপদেশ করিয়াছেন। কেননা একমাত্র বিশুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তিই সেই পরম কারুণিক শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হয়। এই অহৈতুকী ভক্তিই শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতেও সক্ষম।

এই নির্গুণা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ কী? এই পর্য্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৯।১০ শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে মহর্ষি কপিল তাঁহার মাতা দেবহুতিকে উপদেশ করিতেছেন—

"মদগুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণম্ ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

শ্রীভগবানের গুণমহিমা শ্রবণমাত্রেই সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিতা পূতসলিলা জাহ্নবীর ন্যায় সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী বাসুদেব পুরুষোত্তমে মনের অপ্রতিহতা নিরবচ্ছিন্না গতিরূপা অহৈতুকী-ভক্তির যে উদয়—তাহাই নির্গুণা ভক্তিযোগের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া নির্ণীত হয়।

ত্রিগুণাতীত শুদ্ধসত্ব আত্মাতেই এই ভক্তিশক্তির স্ফুরণ হয়। ভগবৎ-ভক্তের নিকট সেবানন্দের তুলনায় মোক্ষানন্দ তুচ্ছ। ইষ্টপ্রীতি সম্পাদনের. জন্য ভক্ত সবই করিতে পারেন। কারণ ভক্ত জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কারে কখনও আবদ্ধ হন না।

শ্রীগুরুকৃপাতেই ঈশ্বর-অনুকম্পায় প্রয়াসশূন্য হইলে ইহা লাভ করা যায়।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী এই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্ ভক্তিরুত্তমা ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির উদ্দেশ্যে জ্ঞানকর্ম্মনিরপেক্ষ কায়মনোবাক্যের যে কোন ক্রিয়াই ভক্তি। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্" এই মহাবাক্য হইতে প্রেমভক্তির পীযূষধারা যেন অহরহঃ নির্ঝরিত হইতেছে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই চরম পুরুষার্থ—ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভজন আর নাই।

শ্রীপাদ রামানন্দ গোস্বামী বিরচিত

গান

(নাম ভজনের ক্রমবিকাশ)

রাগিনী—ভৈরবী ঝিঝিট।

(১)

হরি বলিতে বলিতে নাম নিতে নিতে
আপনা হইতে গলিবে হে মন
তুমি কর নাম গান ঢেলে দেহ প্রাণ
(ওগো) ত্যজ অভিমান ভজ ব্রজধন ॥

(২)

হরি নামে মন মজাইয়ে রাখ
ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে অহরহ থাক
(ওগো) ভক্ত পদরজঃ প্রতি অঙ্গে মাখ
প্রেম রসের তরঙ্গে সাঁতারিতে শিখ ॥

(৩)

ব্রজেন্দ্র নন্দনে যদি প্রাণে চায়
শরণ লহ আগে ব্রজেশ্বরীর পায়
ব্রজরস বিনে সে ধন কে পায়
যাঁহে গোপিকায় করেছে বন্ধন ॥

(৪)

যাবত সেই রস না পশিবে চিতে
বিরত না হইবে হরিনাম নিতে
নামের সাগর মথিতে মথিতে
প্রেম সুধারস উথলিবে চিতে।

(৫)

হরি হরি বলি ডাকিতে ডাকিতে
প্রেমবারি যবে ঝরিবে আঁখিতে
ব্রজরস তখন পারিবে বুঝিতে
পাইবে দেখিতে সে কাল রতন।

গুরো কৃপাহি কেবলম্

শ্রীশ্রীমাধবাষ্টকম্

ওঁ নমো মাধবায় ওঁ

ওঁকারঃ ব্রহ্মশব্দোহি যস্য বক্ত্রাৎ বিনির্গতঃ
ব্রহ্মবিদাত্মনে তস্মৈ মাধবায় নমো নমঃ। ১।
ন গতির্যস্য কুত্রাপি মায়াবদ্ধশ্চ দুঃখিতঃ
তস্যবন্ধবিমোক্ষায় মাধবায় নমো নমঃ। ২।
মোহিতো মোহজালেন সত্যবন্মন্যতে জগৎ
তদ্বিজ্ঞানপ্রদাত্রে চ মাধবায় নমো নমঃ। ৩।
মানাপমানতুল্যায় সুখদুঃখৈরসংযুজে
শিষ্যহৃদিবিহারায় মাধবায় নমো নমঃ। ৪।
ধরায়াং ধৃতদেহো যঃ লীলাচিন্ময়বিগ্রহঃ
তস্মৈ শ্রীসুখরূপায় মাধবায় নমো নমঃ। ৫।
বাণী যস্য প্রবোধায় তস্মৈ বেদান্তভাষিণে
জন্মান্তরনাশকায় মাধবায় নমো নমঃ। ৬।
যত্রযত্রস্থিতস্তং হি তত্তৎতীর্থং ভবেৎ ধ্রুবম্
সর্ব্বতীর্থস্বরূপায় মাধবায় নমো নমঃ। ৭।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম জপতেঽহর্নিশং মুদা
সদানন্দস্বরূপায় মাধবায় নমো নমঃ। ৮।

প্রণাম মন্ত্র ঃ—

ও শান্তায় শান্তরূপায় ভক্তিতত্ত্ববিভাষিণে
দুঃখমোহনাশকায় মাধবায় নমো নমঃ।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

ভ্রম সংশোধন

১	পৃষ্ঠা	মঙ্গলাচরণের ২য় লাইনের শেষে। বসিবে	
২৭	”	৩য় লাইনে আমায় স্থলে আমার হইবে	
৫০	”	২য় লাইনে	? স্থলে। হইবে
৫১	”	৪র্থ লাইনে	। হইবে না
৫২	”	৫ম লাইনে	? স্থলে ! হইবে
৫৪	”	১৯শ লাইনে	? স্থলে ! হইবে
৬২	”	১৫শ লাইনে	তখই স্থলে তখনই হইবে
৬৫	”	১৯শ লাইনে	দৃষ্টপূর্ব্ব স্থলে পূর্ব্বদৃষ্ট হইবে
৭৭	”	১ম লাইনে	নির্যাতীত ” নির্য্যাতিত হইবে
৭৭	”	২০শ লাইনে	দেওয়ায়ই ” দেওয়াতেই হইবে
৮৪	”	১৪শ লাইনে	ভাইএর পর , বসিবে
৯৩	”	২য় লাইনে	কী স্থলে কি হইবে
৯৮	”	২য় লাইনে	নয়ত স্থলে নিয়ত হইবে।

সংবাদপত্রের অভিমত

"গুরু তত্ত্ব সাধনের ক্রম বিকাশ এবং মহাপুরুষ রামঠাকুরের সিদ্ধ শিষ্য মাধব পাগলার সাধক জীবনে তার প্রকাশ এই পুস্তকের প্রধান বিষয় বস্তু। জাতিস্মর মাধব পাগলার অলৌকিক জীবনের এই বিবৃতি পাঠ করে আত্মদর্শনকামী ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন। তা ছাড়া, ভক্তি, ভক্তির আদর্শ, রাগানুগ ভজন, অষ্টাঙ্গ ভজন, জপের ক্রম, সমাধি লক্ষণ প্রভৃতি পরিশিষ্ট বর্ণিত বিষয়গুলি তত্ত্বান্বেষী পাঠকের আদর লাভ করবে।"—যুগান্তর, ১৩ই মার্চ ১৯৬৩

"ধর্ম্মাত্মা সাধকগণ সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরানুরাগী করার জন্য তার মধ্যে প্রেম ভক্তি বিকাশের জন্য নানা প্রকারের উপদেশাদি দিয়ে থাকেন। আলোচিত গ্রন্থখানির মধ্যে সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীরামঠাকুর যে সকল মূল্যবান উপদেশাদি দিয়েছেন, সেই গুরুতত্ত্ব সাধনার ক্রম-বিকাশের চারিটি স্তরের কথা উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থকার মুক্তানন্দ তাঁর গুরু ও শ্রীশ্রীরামঠাকুরের মুখনিঃসৃত মূল্যবান উপদেশসমূহ এই গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থারম্ভে গুরু পরিচয়, গুরুর বংশ পরিচয় এবং তৎপর গুরু তত্ত্ব সাধনার স্তরগুলি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন কি ভাবে সম্ভব আলোচনার মধ্যে এবং মাধব পাগলার সঙ্গে তস্য গুরুর কথোপকথনের মাধ্যমে বহু উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে গ্রন্থখানির মধ্যে। ভক্তি ও জ্ঞান মার্গের পথিকরা এই গ্রন্থের সাহায্যে অবশ্যই উপকৃত হবেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা এই গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করেছে।"—দৈনিক বসুমতী, ৩০শে ভাদ্র ১৩৬৯।